কাজী নজরুল ইসলাম

এক অজ্ঞাত পর্ব

অজিত দাস



পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
৫ই আগস্ট ১৯৫৯

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ
তপন কর

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন প্রিন্টার্স
কলকাতা ৯

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২ বিডন রো
কলকাতা ৬

মণীন্দ্রনাথ বাগ ও
রবি বিশ্বাসকে

লেখকের অন্য বই

জাত বৈষ্ণব কথা

মুখবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলাম কিছুকাল কৃষ্ণনগরে বাস করেছিলেন। তাঁর জীবনী লেখকেরা সকলেই এ বিষয়ে তাঁদের গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণনগরবাসী হিসাবে আমার মনে হয়েছে, আরও কিছু কথা বলার আছে। সেই সব কথা একত্র করে এখানে পরিবেশন করা হলো। এই রচনাটি প্রস্তুত করার সময় বহু হিতৈষী জনের সাহায্য পেয়েছি। স্নেহভাজন ডঃ নীরদবরণ হাজরা তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় বই সরবরাহ করেছেন। নানা বিষয়ে মতামত দিয়ে এবং আলোচনা করে সাহায্য করেছেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট লেখক মোহিত রায়, রবি বিশ্বাস, শতঞ্জীব রাহা, সঞ্জিত দত্ত। সুধীর চক্রবর্তীর প্রেরণামূলক তাগিদ না থাকলে হয়তো এটা লেখাই হতো না। এঁরা সকলেই আমার স্নেহভাজন অনুজপ্রতিম। এঁদের শুভ কামনা করছি।

কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী এস. এম. বদরুদ্দীন তাঁর পিতা এস. এম. আকবরউদ্দীন লিখিত 'চাঁদসড়কে নজরুল' স্মৃতিকথাটির একটি জেরক্স কপি আমাকে পড়তে দিয়েছিলেন। এ জন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃষ্ণনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার পুস্তক পড়তে দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এই সুযোগে। আর আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। প্রয়োজনমতো তাঁর কাছে ছুটে গিয়েছি। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে মতামত দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। খ্যাতনামা প্রকাশক অনুপকুমার মাহিন্দার এই

বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। আরও যাঁরা আমার এই কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সহৃদয় পাঠক যদি গ্রন্থটি পাঠ করে প্রীত হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে। ইতি

বিনত

অজিত দাস

পাত্র বাজার
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

এক

কাজী নজরুল ইসলাম কিছুকাল কৃষ্ণনগরে বাস করেছিলেন। তার স্মৃতি শহরের নানা স্থানে, ব্যক্তিমনে এবং তাঁর সাহিত্য কীর্তির ভিতর ছড়িয়ে আছে। ১৪ মার্চ, ১৯৪২ সাল। সকাল বেলা। শহরের বিদ্যুৎ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। সঙ্গে আছেন কুষ্টিয়ার (বাংলাদেশ) সরকারি কলেজের তরুণ অধ্যাপক ও গবেষক আবুল আহ্‌সান চৌধুরী ও স্থানীয় গবেষক মোহিত রায়। বিদ্যুৎ দপ্তরের বাড়িটার প্রবেশ পথের ডান দিকের দেওয়ালে একটি প্রস্তর ফলক আছে। সেটা জানিয়ে দিচ্ছে যে, কাজী নজরুল ইসলাম এই বাড়িতে ১৯২৬-২৮ সাল পর্যন্ত বাস করেছিলেন এবং এখানে বসেই তিনি গজল গান ও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনা করেছিলেন।

এই ফলক স্থাপন প্রসঙ্গে মোহিত রায় জানালেন যে, এই বিষয়ে তিনিই প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তখন শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করত একটি বে-সরকারী সংস্থা—বি. এন. ইলিয়াস কোম্পানী। এই বাড়িটি ছিল তখন তাঁদেরই সম্পত্তি। তাঁরা এটা কিনেছিলেন। সে সময় যিনি এই কোম্পানীর এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্তা ছিলেন, তিনি এই ফলক স্থাপনের অনুমতি দেননি। এরপর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারি হাতে গেল। বি. এন. ইলিয়াস কোম্পানীর এই সম্পত্তি সরকার অধিগ্রহণ করলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের নদীয়া বিভাগের সুপারিনটেনডেনট হলেন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সানন্দে ওই প্রস্তাবে সম্মতি জানান। সে সময় নদীয়ার জেলা শাসক ছিলেন শ্রী দীপককুমার ঘোষ। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি সরকারি তহবিল থেকে ওই ফলকের ব্যয়ভার বহনের ব্যবস্থা করে দেন। এরপর ফলক বসান হয়।

এই ফলক উন্মোচনের ক্ষেত্রে একটি অভিনব ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়েছিল। ফলকটি উন্মোচন করান হয়েছিল সংলগ্ন পল্লী চাঁদ সড়ক-এর বাসিন্দা জনৈক বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি চাঁদ সড়ক পল্লীর পটভূমিতে রচিত, একটি পরিবারকেন্দ্রিক। কাহিনীর সূচনা থেকে সমাপ্তি অবধি সেই পরিবারের একজনই মাত্র পুরুষ বর্তমান ছিল। তার নাম প্যাঁকালে। কাহিনীর সূচনাকালে সে যুবক অবিবাহিত। উপন্যাসে তার সম্পর্কে বিবরণ হচ্ছে : 'গজালের মার ছোট ছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। কাজও করে, রাজমিস্ত্রীর কাজ। বাবু-ঘেঁষা হয়ে সেও একটা বাবু-গোছ হয়ে গেছে। টেরি কাটে, ছিকরেট টানে, গান গায়, চা খায়, পাড়ার মেয়ে মহলে তার মস্ত নাম। বলে, যেমন গলা, তেমনি গান, তেমনি সৌখিন।'[১]

আরেকটা বিবরণ হচ্ছে : 'প্যাঁকালে মাঝে মাঝে থিয়েটারের ইয়ার বন্ধুদের কাছে দু একটা সিগ্রেট চেয়ে রাখে এবং সেটা কুর্শির কাছ ছাড়া আর কারুর কাছে খায়না।'[২]

চাঁদ সড়ক পাড়ার মানুষের ধারণা—এই রাজমিস্ত্রিই উপন্যাসের সেই প্যাঁকালে, কুর্শি হচ্ছে প্যাঁকালের প্রেমিকা। লোকের ধারণা, কবি সেদিন এই রাজমিস্ত্রির আদলেই প্যাঁকালে চরিত্র এঁকেছিলেন। এই রাজমিস্ত্রির মনেও এই ধারণা লোক প্রভাবে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই তাকে দিয়ে ফলক উন্মোচন করানো হয়েছিল। সেই বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রির প্রকৃত নাম কি ছিল তা মোহিত রায় স্মরণ করতে পারলেন না। ফলক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সেই রাজমিস্ত্রি একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণও দিয়েছিল। সে তার নিজের মতো করেই বলেছিল। মোহিত রায় তাঁর স্মৃতি থেকে সেই ভাষণের খানিক শোনালেন। সে বলেছিল, 'আমি কি তখন অতো কিছু জানতাম! কাজী আমাদের পাড়ায় এই গ্রেস কটেজ বাড়ীতে থাকতেন। আমাকে ডেকে নানা কথা শুধোতেন। যেমন, তুমি বিড়ি খাও? সিগ্রেট খাও? কখন বিড়ি খাও, কখন সিগ্রেট খাও? কেন তা খাও? আবার বলতেন, তুমি কাউকে ভালোবাস? কোন মেয়ের সাথে ভালোবাসা আছে? আমি তখন ছোকরা। এসব

কথা কি বলা যায়? লজ্জা পেতাম।'

এই সব বিবরণ থেকে বোঝা যায়—কবি এই উপন্যাস রচনার আগে কীভাবে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের বসবাসকালে এই বাড়িটার পূর্ব দিকের এই প্রবেশ পথ এবং এই দোতলা বাড়িটি ছিল না। এ অংশটি ইলিয়াস কোম্পানীর সংযোজন। এখনকার এই পরিবেশও তখন ছিল না। চারপাশের দোকানপাট, বাড়িঘর, কোলাহল, যানবাহনের এমন চলাচল—কিছুই ছিল না। ছিল শান্ত নির্জন বাগানবাড়ির পরিবেশ। তবে যে বাড়িতে কবি বাস করতেন সেটা এখনও কাছে। সেটা এখনকার বাড়ির পশ্চিম অংশে অবস্থিত। মোহিত রায় আমাদের সেদিকে নিয়ে গেলেন। এখনকার প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকে পিছনের দিকে একটু গেলেই সেই বাড়ি। প্রশস্ত সবুজ মাঠের মধ্যে বাড়িটা। দু'কামরা বিশিষ্ট বাড়ির সামনে তখন একটা চওড়া বারান্দা ছিল। এখন সে বারান্দাকে ঘরে পরিণত করা হয়েছে। নজরুল ইসলামের বাসকালে বাড়িটা ছিল নাকি পাঁচ বিঘা জমির মধ্যে। এখন আর তা নেই। বি. এন. ইলিয়াস কোম্পানীর কাছে বাড়ি বিক্রী করবার আগে নাকি কিছু জমি বিক্রী করা হয়েছে। সে সব জমিতে এখন রোমান ক্যাথলিকদের মেরী ইমাকুলেট স্কুল এবং আরও কি সব হয়েছে। আর সেই বাড়ির জমির মধ্যেই পুব দিকে বিদ্যুৎ দপ্তরের দোতলা বাড়ি উঠেছে। তবু কাজীর পুরোনো বাসগৃহের সামনে এখনও অনেকটা সবুজ মাঠ আছে। এখনও খোলামেলা পরিবেশ। বাড়ির পশ্চিম এবং উত্তর দিকে কয়েকটি প্রাচীন আম গাছ দাঁড়িয়ে আছে সেকালের বাগান-বাড়ির সাক্ষী হয়ে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে একটি ছবি আছে—কবি আমতলায় চেয়ারে বসে গজল গান রচনায় নিরত। ঘরের কোল-ঘেঁষা প্রথম গাছটাই হবে হয়তো। আবুল আহ্‌সান ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগলেন। বাড়িটার উত্তর দিকে ছিল ভিতর অংশ বা উঠোন। একটা ইঁদারা আছে, পরিত্যক্ত, আগাছায় আচ্ছাদিত। পায়খানাটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

বাড়িটা কিন্তু সযত্নরক্ষিত। ঝকঝক করছে। ওটা এখন সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরের অধিকারে। আদিতে ছিল একজন দেশীয় খৃষ্টান মহিলার। তিনি বেশ রুচিশীলা এবং ধনশালিনী ছিলেন বলেই মনে হয়।

তিনি বাড়িটার নাম দিয়েছিলেন 'গ্রেস কটেজ'। বাড়ির মাথায় সেই সাবেক লেখা নামটিই আছে। রাজমিস্ত্রির অপটু হাতের লেখা সেই আঁকাবাঁকা ইংরাজী অক্ষর। এই বাড়িটায় এখন বিদ্যুৎ দপ্তরের ইঞ্জিনীয়র-এর দপ্তর। প্রশাসকও বসেন।

ঘরে ঢুকলে দেখা গেল সামনের দেওয়ালে কবি নজরুল ইসলামের একখানি বড় ছবি সযত্নে রক্ষিত। তার নীচে লেখা—

'আমরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।'

বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা এসে জড়ো হতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন, আমরা এখানে প্রতি বছর কবির জন্মদিন পালন করি। অনুষ্ঠান করি। গান হয়, আবৃত্তি হয়, কবির সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানাই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। কবি এখন আমাদের লোক। তাঁর ঘরে আমাদের ওঠা বসা।

ঘর ছেড়ে বাইরের মাঠে এসে দাঁড়ালাম একা। মনে পড়তে লাগল শহরের পরিচিত নানাজনের মুখে শোনা কথা এবং তা ছাড়িয়ে আরও অনেক কথা।

এখন এ-বাড়ির প্রবেশ পথ হয়েছে পুবে। কবির বসবাসকালে প্রবেশ পথ ছিল দক্ষিণ দিকে। পুবের পথ রেল স্টেশনগামী পথের সঙ্গে যুক্ত। ফলে পশ্চিমের চাঁদ সড়ক পল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন। দক্ষিণের পথ ছিল চাঁদ সড়ক পল্লীর পথের সঙ্গে যুক্ত। বলতে গেলে চাঁদ সড়ক পল্লীর প্রথম বাড়িই ছিল এটি।

তখন এই ব্যবস্থা ছিল বাড়ির নিরাপত্তার পক্ষে উপযুক্ত। কারণ তখন বাড়ির উত্তর পুব দিকে ছিল বসতি শূন্য। উত্তরে বাগান আর খাল (বেজি খাল) যার পুবে সেগুন বন। মাঝখানে রেলষ্টেশনগামী পথ। আরও উত্তর পুবে—খালের ওপারে ছিল নোদিয়ার পাড়া।

কাজেই এ বাড়ি ছিল চাঁদ সড়ক পল্লীর অঙ্গীভূত।

চাঁদ সড়ক পল্লীর উত্তর-পশ্চিমে রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান পল্লী ছিল। চাঁদ সড়ক ছিল প্রধানত মুসলমান পল্লী। সে সময় এই ঘর দুটির সামনে ছিল একটি খেজুর গাছ। কবি তার নীচে চেয়ার পেতে বসে থাকতেন, ভাবতেন, লিখতেন। কৃষ্ণনগরের স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট সমাজসেবী—শিবরাম গুপ্ত তখন ছিলেন বালক। থাকতেন নোদিয়ার পাড়ায়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে কাজীর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। বালক শিবরামের তাই কাজীর বাড়ি যাতায়াত ছিল। কাজী খেজুরতলায় বসে থাকতেন। শিবরাম দক্ষিণের পথ দিয়ে প্রবেশ করে কাজীকে এড়িয়ে অন্দরমহলে প্রবেশ করতেন চুপিসারে। নইলে হাজার কৈফিয়ৎ দিতে হতো কবির কাছে। কিন্তু বাড়ির গাছের কুমড়ো লাউ কি শাকপাতা নিয়ে গেলে কবি খুশিতে ভরে উঠতেন। এ বিবরণ শুনেছি শিবরাম গুপ্তর মুখ থেকেই।

বাড়ির দক্ষিণে প্রবেশ পথের পাশে, পথের বিপরীত দিকে ছিল বারোয়ারী কলতলা। সেই কলতলায় পাড়ার মহিলারা জল নিতে এসে ঝগড়া বাধাত। সেই ঝগড়ার বিবরণ দিয়েই কবির 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের কাহিনীর শুরু।

কবি তাঁর বিখ্যাত 'দারিদ্র্য' কবিতা এখানে বসেই রচনা করে-ছিলেন। কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। খ্রীস্টিয় তারিখ ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাস।

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: 'একদিন কি কারণে নজরুল কলকাতায় এসে আবার কৃষ্ণনগরে ফিরে যাচ্ছিল। তার আগে সে একবার আমাদের অফিসে এলো। কলকাতায় এলে আমাদের অফিসে সে আসতই। যাবার আগে আমার হাতে সে দারিদ্র্যের পাণ্ডুলিপিখানা দিয়ে বলল, এটা ভাই তুমি কল্লোল অফিসে পৌঁছিয়ে দিও। আমি এবার আর সেখানে যাব না। দিনেশরঞ্জন দাশ মনিঅর্ডার যোগে দশটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। একটা কবিতাও চেয়েছিলেন সেই সঙ্গে। এই

কবিতাটি বড় দুঃখে লিখেছি। বলাবাহুল্য আমি কবিতাটি কল্লোল অফিসে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম…। কল্লোলে ছাপা হওয়ার কয়েকদিন আগেই কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।'

মাঠে দাঁড়িয়ে কবিতাটির বাস্তব পটভূমির কথা মনে জাগতে লাগল।

১৯২৬ সালের ৯ অক্টোবর কবির দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়েছে এই বাড়িতে। সেই দিনই তিনি ব্রজবিহারী বর্মণকে একটি চিঠি লিখেছিলেন।

কৃষ্ণনগর

পরম স্নেহভাজনেষু,

স্নেহের ব্রজ! আজ সকাল ছয়টায় আমার একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। তোমার বৌদি আপাততঃ ভালো আছে। আমিও আজ এলাম যশোহর খুলনা, বাগেরহাট, দৌলতপুর প্রভৃতি ঘুরে। টাকার বড্ড দরকার। যেমন করে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার করে পাঠাও। তুমিত সব অবস্থা জান…ভুলোনা যেন। টাকা কর্জ্জ করেও পাঠাও। স্নেহাশীষ নাও। পত্র দিও। ইতি—
তোমার কাজীদা।[৪]

এরপর ২০. ১২. ২৬ তারিখে আবার এই ব্রজকেই আরেকখানি চিঠি লিখেছেন :

স্নেহের ব্রজ,

আজ আমি শয্যাগত, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি রোগের ও অন্যান্য চিন্তার জ্বালায়। চিন্তার মধ্যে অর্থ চিন্তাটাই সবচেয়ে বড়। কী করে যে দিন যাচ্ছে, ভগবান জানেন। তোমার প্রেরিত পনর টাকা পেয়েছি। পঁচিশ টাকা চেয়েছিলাম অবশ্য, তোমারও বিপদ আপদের কথা শুনলাম। আরও যদি পাঠাতে পার আমার এই দুর্দিনে বড় উপকৃত হব। তুমি ছোট ভায়ের মত, তোমাকে বেশি কি লিখব? তোমার অন্যান্য খবর দিও। সর্বহারা কাটছে কেমন?

তোমার কাজী দা[৫]

ঘরে সদ্যোজাত পুত্র এবং প্রসূতি। হাতে টাকা নেই। গোয়াড়ির গোলাপটির বাড়ি ছেড়ে মাত্র কিছু দিন আগে কবি উঠে এসেছেন এই 'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে। নতুন পরিবেশ। পাশে চাঁদ সড়কের মুসলমান ও রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান পল্লী। গোলাপটির সেই শিক্ষিত সচ্ছল মানুষের পরিবেশ এটা নয়। এখানে নিঃসীম দারিদ্র্যের নিত্য-বসত। তার মধ্যে কবি দেখছেন রোমান ক্যাথলিকদের গীর্জার মধ্যে মাথায় কাঁটার মুকুট শোভিত ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত দেহ যীশুর মূর্তি। এই পরিবেশ, এই বিশেষ অভিজ্ঞতা, পারিপার্শ্বিক বা পরিবেশগত প্রভাব পড়েছে কবির মনের ওপর। তিনি রচনা করলেন 'দারিদ্র্য' কবিতা :

হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা।

* * *

...হায় মোর শিশু
জাগিয়া কাঁদিছ ঘরে খাওনিক কিছু।
খালি হাতে সারা দিন তাপস নিষ্ঠুর
কাঁদ মোর ঘরে নিত্য তুমি ক্ষুধাতুর
পারি নাই বাছা মোর! হে প্রিয় আমার
দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে—মোর অধিকার
আনন্দের নাহি নাহি। দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি।

এই সেই গ্রেস কটেজ বাড়ি। এখানে সেদিন কবির মানসিক অবস্থা ছিল এই রকম। সেদিন কবির দীর্ঘশ্বাস এখানকার বাতাসে মিশে ছিল। হয়তো কবির বেদনাশ্রু ঝরে পড়েছিল এই মাটিতে। মাটি তা জানে। তাই তিনি বন্ধুকে বলেছিলেন, 'এ কবিতাটি অনেক দুঃখে লিখেছি।' এরপর তিনি এই পল্লীর মানুষজন নিয়ে 'মৃত্যুক্ষুধা'

উপন্যাস লিখেছেন। সেখানেও তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন এই দুঃখের বিবরণ।

'অভাবের দিনে প্রিয় অতিথি আসার মত পীড়াদায়ক' বুঝি আর কিছু নেই। শুধু হৃদয় দিয়ে দেবতার পূজা হয়ত করা যায় কিন্তু শুধু-হাতে অতিথিকে বরণ করা চলে না। শুধু হাতের লজ্জা সারা হৃদয় দিয়ে ঢাকা যায় না।'[৬]

প্যাঁকালের বোন পাঁচির স্বামী আবার একটি বিয়ে করেছে। তাই গর্ভবতী পাঁচি স্বামীর সংসার ছেড়ে মার কাছে চলে এসেছে। দরিদ্র অসহায় মা'র প্রসঙ্গে কবি একথা লিখেছেন। কেমন করে সে আসন্ন-প্রসবা মেয়েকে রক্ষা করবে আশ্রয় দিয়ে? এরপর দুধের প্রসঙ্গও এসেছে। প্যাঁকালেদের বাড়ির মেজ বউ সবে টাইফয়েড থেকে উঠেছে। তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

'ওরই কোলে খোকা। স্বামীর শেষ স্মৃতিটুকু। মাত্র দু মাসের। জন্ম অবধি মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে চামচিকের মত হয়ে গেছে। শুষ্ক ক্ষীণ কণ্ঠে অসহায় শিশু কাঁদে আর একবার করে তার কণ্ঠের চেয়েও শুষ্ক মায়ের বুকে একবিন্দু দুধের আশায় বৃথা কান্না থামায় আবার কাঁদে। কান্না ত নয় যেন বেঁচে থাকার প্রতিবাদ। যেন ওকে কে গলা টিপে মেরে ফেলছে। ওর মা-ই তখন চেঁচিয়ে বলে, আল্লা গো, আর দেখতে পারিনে, তুলে নাও বাছাকে, তোমার কাছে ও মরে বাঁচুক।'[৭]

'দারিদ্র্য' কবিতার রেশ বা ছবি এখানেও। কবি যেন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না সেই গভীর দুঃখকে। আবার কবি এই বাড়িতে বসেই রচনা করেছেন গজল গান।

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন সবাই। এখন শুধু নজরুল নিয়ে আলোচনা। সবাই নিজের ভাঁড়ার উজাড় করতে চান। চমকিত করলেন, বিদ্যুৎ দপ্তরের এক প্রৌঢ় নিরাপত্তা কর্মী। বললেন, আমি কবিকে দেখেছি। সকলের দৃষ্টি চলে গেল তাঁর দিকে। কোথায় দেখেছেন?

দমদম বিমান বন্দরে। ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাঁকে। তখন তাঁর বোধশক্তি ছিল না। দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তবুতো দেখেছি। চোখের দেখা।

ঠিকই। তাও তো তিনি দেখেছেন।

দুই

কাজী নজরুল ইসলাম যে কৃষ্ণনগরে ছিলেন সে কথা আমি প্রথম শুনি আমার মাসীমার (মা'র দিদি) মুখে। মামার বাড়িতে, এই গোয়াড়িতেই। তখন আমি স্কুল ছাত্র। মামার বাড়িতে এলেই মাসীমা ওই সব কথা শোনাতেন। মামার বাড়িতে নজরুল ইসলামের কিছু গ্রন্থ দেখতাম। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, বুলবুল, আর মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস। আরেকটি বই ছিল। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'মরীচিকা' কাব্যগ্রন্থ। তার ভিতরের পাতায় লাল কালিতে লেখা ছিল : নজরুল হুগলী। তারিখ ১৩.৪.৩২ (বঙ্গাব্দ)। মাসীমা বলতেন, ওটা কাজীর নিজের বই। ওটা তাঁর হস্তাক্ষর। কাজী প্রথমে আমাদের গোয়াড়ির গোলাপটিতে থাকতেন। আমরা সেখানে যেতাম। তাঁর বউ আর শাশুড়ীর সঙ্গে কতো গল্প করেছি। জ্ঞান সরকার ডাক্তারের ভাই হেমন্ত সরকার কাজীকে কৃষ্ণনগরে এনেছিলেন।

মাসীমার এই সব কথা একদিন আমার বাবাকে (হাজারীলাল দাস, কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলের শিক্ষক ছিলেন) বললাম। তারপর থেকে বাবার কাছে কাজী সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। কাজী যখন কৃষ্ণনগরে এলেন, আমার বাবাও তখন এই শহরে। কাজী হুগলীতে ছিলেন। সেখানে ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন, সংসারে অভাব অনটন চলছিল। তাই হেমন্তকুমার সরকার তাঁকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসেন। কাজীর বয়স তখন মাত্র সাতাশ বছর। তখনই তিনি সুবিখ্যাত মানুষ। বিদ্রোহী কবিতা লিখে নাম পেয়েছেন। কলকাতায় পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

তাতে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধ লিখে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছেন। 'আনন্দময়ীর আগমন' কবিতা রচনা করে সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়ে কারারুদ্ধ হয়েছেন। কারাগারে আমরণ অনশন করেছেন। তা নিয়ে দেশময় আলোড়ন জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থ উৎসর্গ করেছেন এই কবিকে। সেই তিনি কৃষ্ণনগরে এলেন। দেশের সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে কৃষ্ণনগর এক নতুন যুগে প্রবেশ করল।

কৃষ্ণনগরের যুবসমাজ তখন বিপ্লব-চিন্তায় মগ্ন। বাইরে সব ভালো মানুষ। সমাজসেবী। দরিদ্রভাণ্ডার আর সৎকার সমিতি পরিচালনা করছেন। স্কুল কলেজের ছাত্ররা লোকের বাড়ি থেকে মুষ্টির ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করে আনছেন, প্রতিষ্ঠানে জমা দিচ্ছেন। তা দিয়ে দরিদ্রদের সেবা করা হচ্ছে। কৃষ্ণনগরের প্রধান শ্মশানঘাট নবদ্বীপ। আট ন' মাইল দূরে, নদী পেরিয়ে। দূরত্ব, ধনবল, জনবলের অভাবে আবার জাতপাতের প্রশ্নে অনেক গৃহস্থ মৃতদেহ সৎকার নিয়ে মুস্কিলে পড়ত। বিপন্নদের ওপর পেশাদার শ্মশানযাত্রীদের ছিল নানা রকম জুলুম। এরই প্রতিকারার্থে সমাজসেবী যুবকরা সৎকার সমিতি স্থাপন করেছিলেন। বিপন্ন গৃহস্থ সংবাদ দিলেই স্বাস্থ্যসেবীরা ছুটে যেতেন। জনবল, ধনবল কি জাতপাতের সমস্যাই নয় আর। মৃতদেহ সৎকারের সব দায় সৎকার সমিতির। জনসাধারণ ভীষণ খুশি। এই যুবকরা 'সাধনা লাইব্রেরী' নাম দিয়ে পাঠাগার স্থাপন করে পড়াশোনা করছেন, স্বাস্থ্যচর্চা করছেন ও ব্যায়াম প্রদর্শনী দেখাচ্ছেন। ব্যায়ামবিদদের নিয়ে জেলার নানান স্থানে ঘুরছেন, প্রদর্শনী করছেন। তার নেতা ছিলেন সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তী জীবনে ইনি ছিলেন নদীয়া জেলার সি. পি. আই. নেতা। এই যুবকদল ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত। এই সব সংগঠনের ছিল দুটি উদ্দেশ্য। একটি হচ্ছে জনসাধারণকে বুঝতে না দেওয়া তাঁদের গোপন কার্যকলাপ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যুবকদের বিপ্লবী দলে টানা। বাবার কথায়, সেদিন এই যুবক দলের নেতা ছিলেন তারকদা (তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

স্বাধীনোত্তর কালে ইনি ছিলেন নদীয়ার কংগ্রেস নেতা। অন্যদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন গোবিন্দপদ দত্ত, অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত। শেষ দুজন সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তা করতেন। নজরুল যখন কৃষ্ণনগরে এলেন, অনন্তহরি তখন দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় ধরা পড়ে আলিপুর জেলখানায় বন্দী। শহরের যুবকরা এই সময়েই নজরুল ইসলামকে পেলেন তাঁদের মধ্যে। তাঁরা নজরুলকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্বর্ধনা দিলেন। গোয়াড়ির ছুতোরপাড়ায়, এখন যেখানে অমরভারতী স্কুল—ওরই পাশে, মাঠে সম্বর্ধনা সভা হয়েছিল। আমার বাবা সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। শহরের বিশিষ্ট জন বলতে তেমন কেউ উপস্থিত হননি। কারণ, বাবার মতে, পুলিশের ভয়ে। একে বিপ্লবী যুবকদের সভা, তাতে নজরুলের সম্বর্ধনা। পুলিশের নজর থাকবেই। উকীলদের মধ্যে শামসুদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইনি কুষ্টিয়ায় মানুষ। তখন কৃষ্ণনগরে ওকালতি করতেন। পরে অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন। সভায় অভিনন্দনপত্র পাঠ করেছিলেন গোবিন্দপদ দত্ত। লেখাটিও ছিল তাঁর। তিনি তখন কৃষ্ণনগরে টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। অভিনন্দনের উত্তরে কাজী বললেন, বক্তৃতা না দিয়ে গান গেয়ে শোনাই। ধরলেন জাতের নামে বজ্জাতি-গান। কিন্তু একটানা পুরো গান না গেয়ে এক কলি গেয়ে খানিক বক্তৃতা করে আবার গাইতে লাগলেন। বক্তৃতায় বললেন, দেশ থেকে গোঁড়া লেবু আর পাতি লেবুর উচ্ছেদ করতে হবে। লেবু গাছ থাকতে দেশের মঙ্গল হবে না। এরপর বললেন, দেশের রাজনীতিতে এখন তিনটি দল আছে। নরমপন্থী ইংরাজের সঙ্গে আপোষ চায়। মধ্যপন্থী-যারা কিছু হৈচৈ করে স্বায়ত্তশাসন চায়। চরমপন্থী যারা ইংরাজকে মেরে দেশ ছাড়া করতে চায়। তা আমি বলি কি—ধামা-ধরা (নরমপন্থী) জামা-ধরা (মধ্যপন্থী) দিয়ে কিছু হবে না। আজ টুঁটি ধরার (চরমপন্থী) দল চাই। ইংরাজকে টুঁটি টিপে মারতে হবে।

তিন

কাজী নজরুল ইসলামকে দেখিনি। হেমন্তকুমার সরকার, গোবিন্দ-পদ দত্ত, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত প্রভৃতিকে দেখেছি। এঁরাই সেদিন কবির ঘনিষ্ঠজন ছিলেন। গ্রেস কটেজ বাড়িতে দাঁড়িয়ে এঁদের কথাই মনে পড়তে লাগল।

হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী বন্ধু। সুভাষচন্দ্র তাঁর একটি গ্রন্থে লিখেছেন যে হেমন্তকুমারই তাঁর রাজনৈতিক দীক্ষাদাতা। রাজনীতিতে হেমন্ত-কুমার ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুগামী। ছিলেন স্বরাজ্য-দলের চীফ হুইপ। শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। নজরুল প্রকাশিত 'লাঙল' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'জাগরণ' পত্রিকার। কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন গ্রন্থকার। 'সুভাষের সঙ্গে বারো বছর' বইটি একদা জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কিছু বই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধও হয়েছিল। তিনি প্রকাশকও ছিলেন। তৎকালীন কৃষ্ণনগরে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ। তখন বঙ্গদেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি।

আমি যখন দেখলাম তখন তিনি বৃদ্ধ। তখন তিনি স্বাধীনোত্তর কালের কৃষ্ণনগরে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা করছেন। উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েদের সংগঠিত করে বিদ্যালয়ে বসে শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর জীবনের শুরু কিন্তু সমাজসেবা দিয়ে। ছাত্রজীবনে ১৯১৫ সালে গোয়াড়ির মালোপাড়ায় শ্রমজীবীদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষকতা করেছেন। সেদিন এই কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সে বিদ্যালয়ের উদ্বোধক ছিলেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী।

শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় প্রসঙ্গে মুজফফর আহমদ তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন, 'কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক এলাকায় উঠে আসার পরে শ্রীহেমন্ত কুমার সরকারের সহযোগে নজরুল একটি শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। খবর পেলাম এই বিদ্যালয় নাকি এখনও আছে। তবে তার নাম নাকি তারকদাস ব্যানার্জী বিদ্যালয় বা বিদ্যাপীঠ হয়েছে।'[৮]

হেমন্তকুমারের সহযোগে নজরুল ইসলাম শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, এমন তথ্য মিলছেনা। হেমন্তকুমার সরকার শহরে একটিই শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তার কথা আগেই বলা হয়েছে। মুজফফর আহ্‌মদ সাহেবের গ্রন্থটির এই সংস্করণ-এর ভূমিকা লিখেছেন লেখক ১৫ই অক্টোবর ১৯৬৯ সালে। এই সময় অবধি নৈশ বিদ্যালয়টি চলছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন এবং এও দেখেছেন যে বিদ্যালয়টির নামকরণ হয়েছে তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে।

বাস্তবে কিন্তু এমন কোন শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই নেই বা ছিলনা স্বাধীনোত্তর কালে, বলে জানা যাচ্ছে। আর তারকদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নামে এমন কোন বিদ্যালয়ই নেই। একটি মাত্র জুনিয়র হাই বালিকা বিদ্যালয় আছে—তারকদাস শিক্ষাসদন। সেটি স্বাধীনোত্তর কালে স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত।

হেমন্ত সরকার প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ও অচল হয়েছিল বহুপূর্বেই। তার বাড়িটি আছে মিউনিসিপ্যালিটির অধিকারে। সেখানে সকালে এবং দুপুরে দুটি সরকারী স্পনসর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চলে। সে বাড়িতে একখানিই মাত্র ঘর। সে বাড়িটি এখনকার জেলা শিক্ষাদপ্তর বাড়ির পাশে অবস্থিত।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন তখন তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চাষা পাড়ার পাশে মেথর পাড়ায় একটি নৈশ বিদ্যালয় চালাতেন স্বেচ্ছাসেবী যুবকদের সহযোগিতায়। সেখানে নজরুলের কোন ভূমিকা ছিলনা। নজরুল স্থাপিত কোন নৈশ বিদ্যালয়ের কথা স্থানীয় কারও স্মৃতিতেই মিলছেনা।

স্বাধীনোত্তর কালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে হেমন্তকুমার কেন্দ্রীয়

আইন সভায় নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্দল প্রার্থী। প্রতীক পেয়েছিলেন নৌকা। গোয়াড়ির যে-মালোপাড়ায় তিনি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেই পাড়া থেকে এককালে সঙ্ বার হতো। মালোপাড়ার সঙের সে কালে খুব খ্যাতি ছিল। অনেকদিন পরে হেমন্তকুমারের নির্বাচনী প্রচার উপলক্ষে আবার সেই সঙ বার হলো। গোরুর গাড়ীর অপর বাঁশের বাখারি আর কাপড় দিয়ে বিশাল এক নৌকা বানিয়ে তার ভিতর দাঁড়িয়ে গান। ময়ূরপঙ্খীর গান। মূল গায়ক ছিলেন জগদীশ আচার্য। তাঁর বাড়ি ছিল চুয়াডাঙ্গা মহকুমায়। উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এসে বাস করছিলেন। জ্যোতিষ চর্চা করতেন। গানটি আমার সংগ্রহে নেই। ধুয়োটা মনে আছে :

হায় বাঙালি সব খোয়ালি।
প্রাণে পড়লি মারারে
তাই হেমন্ত দিচ্ছে অভয়
নায়ে উঠে আয়রে।

বিকাল বেলা, মালো পাড়ার সামনে সিং দরজার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই গান শুনে মনে হলো এতে নির্বাচনের কোন সুবিধা হবে? লোকে হাসছে, কটু মন্তব্য করছে।

পরদিন সকালে পথে দেখা হতেই হেমন্তকুমার বললেন, গান শুনেছেন, কেমন লাগল?

গানতো শুনলাম, কিন্তু—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, কিন্তু থাক। নির্বাচনে জেতার জন্য গান নয়। মালোপাড়ায় অনেকদিন সঙ বার হয়নি। ওরা ধরল। বললাম, লাগাও। ওরা লাগিয়ে দিল। লোকে শুনল, হাসাহাসি করল। মজা হলো। লোকে জানল যে হেমন্ত সরকার এখনও মরেনি। জেতার জন্য কি নির্বাচনে দাঁড়ান? এও মজা করা। ইংরাজ তাড়ানো আন্দোলন, ফাঁসি কাঠে প্রাণ দেওয়া—সে কি একদল লোকের ভোটে জিতে জিতে সস্তায় কিস্তিমাৎ করার জন্য। ভুল বুঝিয়ে ভোটে-ছলনা-লোক ঠকানো—কাণ্ডারি হুঁশিয়ার—অনেক দুঃখ

আছে সামনে। নিরভিমান, সুরসিক, কৌতুকপ্রিয়, প্রাজ্ঞ এই মানুষটির প্রতি বড়ই আকর্ষণ বোধ করতাম। কাণ্ডারি হুঁশিয়ার গানতো কাজী এই শহরে বসেই লিখেছিলেন। তখন এই হেমন্ত সরকারের তত্ত্বাবধানেই ছিলেন তিনি, গোলাপটিতে।

লিখেছিলেন হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কবির সেই আবেগময় বাণীর কী করুণ পরিণতি! হেমন্তকুমার হতাশ। কণ্ঠে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সুর। হেমন্তকুমারের সঙ্গ কামনা করতাম তখন খুব। স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা থেকে উৎসারিত তাঁর বিদ্রূপবাণী শুনতে ভালো লাগত। কাজী নজরুলও সুস্থ থাকলে হয়তো এরকমই বেদনাহত হতেন। হেমন্তকুমারের খড়ো পাড়ার বাড়িতে বসে একদিন চা পান করতে করতে প্রশ্ন করলাম, নজরুলকে কৃষ্ণনগরে তো আপনিই এনে-ছিলেন। সুপ্তোত্থিতের ভঙ্গীতে তিনি বললেন, আরে হ্যাঁ—সে এক কাণ্ড! ট্রাম ধরার জন্য ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছি। একটা ট্রাম এসে থামল। অমনি ট্রাম থেকে একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। তুলে দেখি কাজী। পায়ের ধুলো নিচ্ছিল সে। টেনে তুলে বললাম, কিরে এমন ঝড়ো কাকের মতন চেহারা কেন? সে ককিয়ে উঠল, দাদা মরে গেলাম। ম্যালেরিয়া ছাড়ছেনা, সংসারও চলেনা। হুগলীতে দেনা বাড়ছে। বললাম, তা অতো ভাবনার কি আছে? আমাদের কৃষ্ণনগরে চল। সব ঠিক হয়ে যাবে। সে চলে এলো।

বিবরণ শুনে বিমর্ষ হলাম। আমার সঙ্গে উনি রঙ্গ করলেন। প্রবীণেরা শুনে বললেন, সোনায় খাদ না মিশালে গহনা হয়না। নিখাদ তথ্য দিয়েও বৈঠকী গল্প হয়না। হেমন্ত বাবু এখন বৈঠকী গল্পের রাজা।

তিনি সেদিন সবই বলেছিলেন, একটু রঙ চড়িয়ে। আমি শুনতে চেয়েছিলাম আন্তরিক ঘরোয়া কথা। সে সুযোগ না মেলায় বিমর্ষ হয়েছিলাম। কিন্তু ওই মানুষটিই নজরুলকে কৃষ্ণনগরে এনেছিলেন। মুজফফর আহমদ লিখেছেন: 'নজরুলের দুর্দিনে শ্রীহেমন্তকুমার সরকার তাকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে গিয়ে তার অশেষ উপকার করেছিলেন।'[৯]

কাজী নজরুলের সম্বর্ধনা সভায় স্বরচিত অভিনন্দন পত্র পাঠ

করেছিলেন গোবিন্দপদ দত্ত। মেধাবী ছাত্র, অনেক পড়াশোনা। নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশ দেশব্যাপী ধরপাকড় শুরু করে। গোবিন্দপদও ধৃত হলেন। তাঁকে বন্দী করে রাখা হলো মেদিনীপুরের হিজলী জেল-এ। সেখানে অনশন-রত রাজবন্দীদের ওপর পুলিশ গুলি চালাল। গোবিন্দপদর হাতে গুলি লাগল। তাঁর একটি হাত কেটে বাদ দিতে হলো। বাঁ হাত। স্বাধীনোত্তর কালে তাঁকে দেখেছি। লম্বা ফর্সা। গায়ে সর্বদা চাদর জড়ান—একখানা হাত না থাকায়। শরীর অসুস্থ, আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তিনি ছিলেন আমার বাবার কলেজ জীবনের সহপাঠী। বাবা দুঃখ করতেন—গোবিন্দর বড় কষ্ট। অথচ সে কতো ভালো ছাত্র ছিল। ইংরাজী এবং বাংলা দুটো ভাষাতেই যে যেমন লিখতে পারত তেমনি বক্তৃতা দিত, আবৃত্তি করত—কত গুণ ছিল তার। রাজনীতি করতে গিয়ে আজ পথে বসেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে লোকে নেচে বেড়ায়। গোবিন্দ কাঁদছে। তাকে কেউ দেখেনা।

আমরা তখন সবে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছি। বাবা একদিন তাঁকে দুপুরে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি এলেন। বাবা সেসময়, বোধহয় আমাকে শোনাবার জন্যেই বললেন, কাজীর সম্বর্ধনা সভায় তুমি অভি-নন্দন পত্র পাঠ করেছিলে। কাজী লেবু গাছের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তোমার লেখাটা খুব ভালো হয়েছিল। আজও মনে আছে। গোবিন্দপদ বলে উঠলেন, আর কাজী। সেও শেষ, আমিও শেষ। কী ঘটল আর কী ঘটছে—সবইতো দেখছ ভাই। কাজী কার আমরা কি এটা চেয়ে-ছিলাম ? বাবা বললেন, তোমার কষ্টই যদি ওরা মোচন না করে, দেশের কষ্ট মোচন করবে ওরা কিভাবে—সেতো বুঝবেই না।

তুমিও যেমন। গোবিন্দপদ দুঃখের হাসি হাসলেন। দেশকেই এখন দেশের কথা ভাবতে হবে। তার দিকে কেউ তাকাবেনা।

শেষজীবনে গোবিন্দপদ দত্ত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, সামান্য বেতনে। তাঁর কাছ থেকে এর বেশি আর কিছু জানতে পারিনি নজরুল সম্পর্কে।

প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাঁর ডাক-নাম ছিল মঘা। তাঁর বাবার নাম হর্ষনাথ সেন। তিনি কৃষ্ণনগরে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। আদি নিবাস ঢাকা। কৃষ্ণনগরে বাড়ি করে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম যখন কৃষ্ণনগর এলেন প্রমোদরঞ্জন তখন কৃষ্ণনগর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সেই বছর মে মাসে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন বা জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশন হয়েছিল। এই সম্মেলন উপলক্ষে নজরুল ইসলাম শহরের যুবকদের নিয়ে একটি ভলান্টিয়ার দল বা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তিনিই হয়েছিলেন দলের অধিনায়ক, প্রমোদরঞ্জন হয়েছিলেন এই দলের সহকারী অধিনায়ক। ফলে প্রমোদরঞ্জন সহজেই নজরুলের কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তিনি বেশি দিন নজরুলের সান্নিধ্যে থাকতে পারেননি। ওই বছর সেপ্টেম্বর মাসে আলিপুর জেলখানায় অনন্তহরি মিত্রর ফাঁসি হলো। প্রমোদরঞ্জন ছিলেন অনন্তহরির বিপ্লবী দলের সক্রিয় কর্মী ও অন্যতম নেতা। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হলেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো একটি শর্তে। দেশে থাকা চলবে না। দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ তিনি নির্বাসিত হলেন। তিনি কারাগার থেকে বেরিয়েই ইংলণ্ড চলে গেলেন। দীর্ঘদিন আর দেশে ফেরা সম্ভব হয়নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। হিটলারের আমলে ফ্রান্সে কারারুদ্ধ হন। সুভাষচন্দ্র জার্মানী গিয়ে আজাদহিন্দ্ বাহিনী গঠন করলে তিনি মুক্তি পেয়ে তাতে প্রচার দপ্তরের দায়িত্ব নেন। হিটলারের পতনের পর তিনি আবার কারারুদ্ধ হন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে তিনি মুক্তি পেয়ে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি কৃষ্ণনগরে এসে, শহরে সেদিন তিনি পেয়েছিলেন বীরের মর্যাদা। রেলস্টেশন থেকে শোভাযাত্রা করে তাঁকে বাড়িতে আনা হয়েছিল এবং সভা করে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লোটি সেন ছিলেন জার্মান মহিলা। প্রমোদরঞ্জনের একটি

জীবনী পুস্তিকায় পড়েছিলাম যে এই মহিলা ছিলেন কার্ল মার্কস-এর সঙ্গী এঙ্গেলস-এর পরিবারের কন্যা। হেমন্ত সরকারের মতো প্রমোদরঞ্জন ও প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্র থেকে বিধান সভার আসনে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন। এই একই কেন্দ্র থেকে নির্বাচন প্রার্থী হয়েছিলেন গোবিন্দপদ দত্ত এবং বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দুজন নির্দল প্রার্থী, বিজয়লাল কংগ্রেস প্রার্থী। সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় আমি প্রমোদরঞ্জনের প্রচারে সাহায্যকারী হিসাবে ক'দিন কয়েকটি পাড়ায় ঘুরেছিলাম তাঁর সঙ্গে। একটি পাড়ায় আমার এক পরিচিতা মহিলা একদিন বললেন, কেন ঘুরছ, মেয়েরা কেউ ভোট দেবে না মঘাদাকে। মেম বিয়ে করেছেন, উনি আবার স্বদেশী কোথায়! কথাটা মঘাদাকে বলতেই পথের ধারে থমকে দাঁড়িয়ে মহাবিপ্লবী করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, ভাই এটা কি বিচার হলো? তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। কি বলব? তখন সদ্য স্বাধীন দেশে কংগ্রেসের পালে প্রবল হাওয়া। প্রমোদরঞ্জন, গোবিন্দপদ সকলেই পরাজিত হলেন। নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস প্রার্থী বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। ফলাফল ঘোষিত হলে সেদিন বিকালে প্রমোদরঞ্জনের সঙ্গে কৃষ্ণনগর জজকোর্টের মাঠে বসেছিলাম। প্রমোদরঞ্জন আক্ষেপ করে বললেন, কতো কাল পরে দেশে ফিরলাম। কৃষ্ণনগরকে আজীবন ভালোবেসেছি। ভেবেছিলাম বাকী জীবনটা এখানেই কাটাব। শহরবাসী আমাকে গ্রহণ করল না। তিনি কলকাতা চলে গেলেন। নজরুল সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা জানা সম্ভব হলো না। শুধু দেখা গেল এই সব আদর্শবাদী ব্যক্তিদের, যাঁরা একদিন নজরুলের সান্নিধ্যে এসেছিলেন বা নজরুল যাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে এসে।

চার

'গ্রেস কটেজ' বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর মোহিত রায় আমাদের নিয়ে গেলেন 'চাঁদ সড়ক' পল্লীর এক বাড়িতে। এক বৃদ্ধা মহিলা আমাদের আপ্যায়ন করে ঘরের বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে চৌকি

পাতা, চেয়ার পাতা। তিনি বসতে বললেন। নিজে মেঝেয় বসে চৌকির তলা থেকে পানের বাটা বার করে সামনে নিয়ে বললেন, বলুন, কি জন্য এসেছেন ?

মোহিত বললেন আমরা এসেছি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে জানতে। তিনি তো আপনাদের এই বাড়ীর পাশেই থাকতেন। আপনি কি তাঁকে দেখেছেন ?

দেখব না কেন ? আমাদের এই বাড়িতেই কতো এসেছেন। এটাতো আমার বাবার বাড়ি।

কাজীর সঙ্গে আপনার পরিচয় ছিল ?

আমাকে নানী বলে ডাকতেন। আমার বয়স তখন ন-দশ বছর। তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের রুবি তো আমি। আমাকে নিয়ে লেখা। কাজীদা আনসার আমি রুবি।

মহিলার বক্তব্য শুনে চমকে উঠতে হলো, হাসিও পেল। উপন্যাসের আনসার এবং রুবি—দুজনই বহিরাগত। নজরুল না হয় আনসার হলেন। কিন্তু রুবি ? সে নদীয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে। উপন্যাসে তার সম্পর্কে বিবরণ হচ্ছে : 'রুবির বিয়ে হয়েছিল একজন আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী ছেলের সাথে।···তার নাম মোয়াজ্জেস। বিলেত যাবার আগেই বিয়ের এক মাসের মধ্যে সে মারা যায়।···বিয়ের আগেই রুবি ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ও এবার প্রাইভেটে আই. এ. দেবে।'[১০]

আর এক জায়গায় আছে 'তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা নাকি এ বিয়ে দিয়েছিলেন এবং আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন তলে তলে—তার মতামতের অপেক্ষা না রেখেই।'[১১]

তাঁরা অর্থে রুবির বাবা মা। রুবি আনসারকে ভালোবাসে।

এ হেন রুবি চরিত্রের দাবীদার এই মহিলা ?

কৌতূহল জাগল খুবই। আবুল আহ্সান প্রশ্ন করলেন, আপনি যে রুবি তা কেমন করে জানলেন ? কাজী আপনাকে বলেছিলেন ?

না। লোকে বলত।

কোন লোক ?

আকবর কাকা, জহুর কাকা বলতেন, তোকে নিয়ে লেখা। তুই রুবি। আবুল আহ্সান আবার প্রশ্ন করলেন, রুবির সঙ্গে আপনার মিল কোথায় ?

রুবি বিয়ের পর বিধবা হয়েছিল। আমিও তাই। ন' বছর বয়সে বিয়ে হলো, ক'মাস পরেই বিধবা হলাম। ওই রাজবাড়ির কাছে আমার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী গোয়াড়ির সি. এম. এস. স্কুলে পড়ত। টাইফয়েড হলো। ভালো চিকিৎসা হবে বলে বাবা এই বাড়িতে নিয়ে এলো। কিন্তু বাঁচল না।

এই মহিলার নাম গফুরন্নেসা বিবি। বয়স বললেন, সত্তর। তিনি বললেন, রুবির মতোই আমি জেদী ছিলাম। রুবির বাবার মতন আমার বাবাও তলায় তলায় আমার আবার বিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। আমি রাজী হইনি।

আপনার বাবা কি করতেন ?

ঠিকাদারী। এই বাড়িঘর আমার বাবার তৈরী। চাঁদ সড়কের ওই মসজিদ আমার ঠাকুর্দার তৈরী।

· আপনি পড়াশোনা করেছেন ?

সেভেন অবধি পড়েছি। পাড়া দাপিয়ে বেড়াতাম। গাছে চড়তাম, সাইকেল চালাতাম। আমাকে ঠেকায় কে ? আমি কোন কথা শুনবই না। কাজীদার বাড়ি গেলেই দুলুদি মানে কাজীদার বউ প্রমীলাদি বলতেন, ওই দেখ তোমার নানী এসেছে। আবুল আহসানের প্রশ্ন হলো, কাজীদা আপনাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতেন ?

না। তেমন কিছু না। তিনিই আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন খেতেন। প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে বসে থাকতেন। আমি ওখন যেমন বেপরোয়া—পাড়া দাপাতাম—কাজীদাও তেমনি আমাদের চাঁদ সড়ক পাড়ার পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন। সেসব নিয়েই তো মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস। সব এই পাড়ার কথা-মোংলা পুকুর, গোল পুকুর, এই মসজিদ এই গীর্জে-পাদরী-সিস্টার—এ পাড়ার

মেয়ে পুরুষ—সব ধরা আছে ওতে। সব আমাদের পরিচিত।

আবুল আহ্সান আবার প্রশ্ন করলেন, কাজী আপনাকে ভালোবাসতেন, না আপনি কাজীকে ভালোবাসতেন ?

যেন লজ্জিতা হলেন বৃদ্ধা। মুহূর্তখানেক। তারপর বললেন, আমি দাদার মতন দেখতাম, তিনি বোনের মত দেখতেন। ভাইবোন সম্পর্ক।

ঠিক করে বলুন।

গফুরন্নেসা মুচকি হেসে বললেন, ওই হলো। কি আর বলব। ভাইবোন-ভাইবোন।

আবুল আহ্সান তবু ছাড়বেন না। আবার প্রশ্ন : কাজী আপনাকে আদর-টাদর করতেন না ?

হাঁটুর ওপর বসিয়ে নাচাতেন।

এরপর বৃদ্ধা কেমন অন্যমনস্ক হলেন। খানিক পরে বললেন, কাজীদার অনেক মুরগী ছিল। আর তাদের অনেক নাম ছিল। রঙ্গিলা, ফিরোজা। এখান থেকে চলে যাবার সময় ফিরোজাকে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার কাছে।

কাজীর মৃত্যুর খবর পেয়ে আপনার মন খারাপ করেনি ?

খুব কেঁদেছিলাম।

আপনি আর বিয়ে করেননি ?

হ্যাঁ, আবার বিয়ে করতে হলো আটাশ বছর বয়সে। কী করব ? বাবা তো বেঁচে নেই। দিদি জামাইবাবু মাথার ওপর। তাদের হুকুম হলো বিয়ে করতে হবে। আমি তখন দিনরাত বই পড়তাম। কবিতা লিখতাম. গান লিখতাম।

আপনি কবিতা লেখেন—গান লেখেন ?

এখন আর পারিনে।

সে সব লেখা আছে ?

না, ওই যে বললাম, জামাইবাবু বলল, বিয়ে করতে হবে। আমি বললাম, না বিয়ে করব না। তখন জামাইবাবু রেগে গিয়ে বলল, ছুঁড়ীর ওই পড়াতেই মাথা খেয়েছে। বলে, আমার সব লেখাপত্র নিয়ে

গিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিল। বলল, বিয়ে করতেই হবে। তো বিয়ে করলাম। সন্তান হয়নি। স্বামীর নাম ফজলে হক। কলকাতায় ডাকঘরে চাকরী করতেন। এখন মুর্শিদাবাদে থাকেন। তাঁর আগের পক্ষের ছেলের কাছে। মাঝে মাঝে আসেন। আমি এক আত্মীয়র ছেলেকে পোষ্য নিয়েছি।

আর লেখালেখি করেন না?

করেছি। ঘরে নেই। দু একটা মনে আছে।

বলতে পারেন?

তা পারি।

বলুন তাহলে।

গফুরন্নেসা বিবি তাঁর স্বরচিত কবিতা মুখস্থ শোনালেন। কবিতার নাম 'আমরা নারী'।

বিধির বিধানে সৃষ্ট আমরা বিশ্বের মাঝে নারী
আমরা কি শুধু ঘোমটা টেনে নাড়ছি হাতা ও বেড়ী?
ষোল কলা নিয়ে জন্ম মোদের ষোল রূপ আমরা ধরি
মাতা ভগিনী জায়া হয়ে তাই সুগৃহ সৃজন করি।
আমরা মানবী দেবী ও দানবী আমরা যে পিশাচী
আমাদেরই নাম মহামায়া যে গো আমরা দেবকী।
রামায়ণের মহাসমরে আছে নিদর্শন বহু
লেহন করেছি চামুণ্ডা রূপে রক্তবীজের লহু।
দানবদলনী অসুরনাশিনী মূর্তিতে আবির্ভূতা।
নারী রূপে যেথা বিরাজ করেছে চিন্ময়ী দুর্গামাতা।
মোদের তুষিতে ভোলা মহেশ অঙ্গে মাখিল ছাই
পদ বন্দনা করিল মাতার বক্ষ পাতিয়া তাই।
মোরা অমানিশার ভয়াল ভীষণা বিষ-ওষ্ঠ সাপিনী
চুম্বনে দিই নীল করে সবই চাহনিতে জ্বালি অশনি।
মোরা মায়া ভরা রাতে মধুচন্দ্রিমায় ফুল্ল কুসুম কামিনী
নিঃশ্বাসে বায়ু সুরভিত করে পোহাই মধু যামিনী।

মোরা আরও কতো যে কী—

পরিচয় শুধ বধূ মাতা নয়, সুন্দরী প্রকৃতি ॥

গফুরন্নেসা বিবি শুধু সাহিত্য সঙ্গীত চর্চাই করেননি, রাজনৈতিক দলেও ঘুরেছেন। প্রথমে ছিলেন মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির দলে। বললেন, গৌতমের মা মঞ্জু দেবী—তাঁর সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি করেছি।

মঞ্জু দেবীর সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি করেছেন?

মঞ্জু দেবী ছিলেন অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ক্ষিতীশপ্রসাদ ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র। ক্ষিতীশবাবু ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর সহপাঠী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। মঞ্জু দেবী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ওঁদের পুত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাসবিদ। কলকাতায় জাপানী বোমা পড়লে ওঁরা কৃষ্ণনগরে গোয়াড়ির মালোপাড়ায় জ্যোতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় উকিলের বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। তখন ক্ষিতীশপ্রসাদ ছিলেন নদীয়ার এ্যাড হক কংগ্রেসের সভাপতি। মঞ্জু দেবী ছিলেন নদীয়ার মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নেত্রী। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র গৌতম চট্টোপাধ্যায় করতেন ছাত্র ফেডারেশন। সেটা ১৯৪৩ সাল। তার মানে গফুরন্নেসা বিবি তখন মঞ্জু দেবীর সঙ্গে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ করতেন।

গফুরন্নেসা বললেন, তারপর দেশ স্বাধীন হলে কংগ্রেসে চলে গেলাম। প্রফুল্লদা (ভট্টাচার্য) আমাকে কংগ্রেসে ডেকে নিলেন। জানেন, ইন্দিরা গান্ধী কৃষ্ণনগরে এলে তাঁর সঙ্গে ফটো তুলেছি।

গফুরন্নেসা বিবি সে ফটো দেখালেন।

এতো কিছু করলেও তিনিই যে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের রুবি এটা ঠিক প্রমাণ করতে পারলেন না। ওটা তাঁর শোনা কথা। মনে হলো অন্যের মুখে শুনে বিশ্বাস করেছেন, এবং মনে মনে নিজেকে রুবি ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন। নজরুল-এর প্রতি সেদিনের বালিকা

আকর্ষণ বোধ করেছেন, পড়াশোনা করেছেন আর কাজীর অনুকরণে কবিতা রচনার অনুশীলন করেছেন। কাজীর প্রভাবে একটি নারী জীবনের এটা উত্তরণ বৈকী।

নজরুল ইসলাম যখন চাঁদসড়কে বাস করতেন, তখন তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন এস. এম. আকবরউদ্দীন। তিনি তখন ছিলেন কৃষ্ণনগরে জজ আদালতের কর্মী, অনুবাদক। সেই সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। নজরুল চাঁদসড়কে বাস করতে আসার কিছুকাল পরেই আকবরউদ্দীনের পত্নী বিয়োগ হয়। তখন নজরুলই ঘটকালি করে তাঁর পরিচিত হুগলীর এক পরিবারের মেয়ে আখতার উন্নেসার সঙ্গে আকবরউদ্দীনের বিয়ে দিয়ে দেন। ইনিই গফুরন্নেসা বিবির আকবর কাকা। এঁর ভাই জহুরুদ্দিন সাহেব ছিলেন উকীল। এঁরাই গফুরন্নেসাকে বলেছিলেন যে, তুই-ই মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের রুবি। এই আকবরউদ্দীনও সাহিত্য চর্চা করতেন। কাজের চাপে তাঁর সাহিত্য চর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসও হারিয়েছিলেন। তারপর গফুরন্নেসা বিবির মতোই নজরুলের সংস্পর্শে এসে আত্মবিশ্বাস ফিরে পান এবং নতুন উদ্যমে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। চাঁদসড়কে নজরুলের উপস্থিতির এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

এ প্রসঙ্গে আকবরউদ্দীনের জীবনী গ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর বক্তব্য হচ্ছে :

এক সময়ে লিখতে পারার যে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম ১৯২৭ সালে নজরুল আমাকে সাহায্য করেছিলেন সেই বিশ্বাস ফিরে পেতে। সেই সময় যদি না আমাকে আবার লিখতে উৎসাহ ও তাগিদ দিতেন, তাহলে আজ যেটুকু পেয়েছি ও বর্তমানের এই নিঃসঙ্গ অবসর জীবনে যে উপায় হয়েছে তা হয়ত কেন নিশ্চয়ই হোতনা।[১২]

দেশ বিভাগের পর আকবরউদ্দীন ও জহুরুদ্দীন—উভয়েই ঢাকাবাসী হন। এই আকবরউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এস. এম. বদরুদ্দিন এখন কৃষ্ণনগরবাসী, আইনজীবী। নজরুল ইসলামকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই। কারণ তাঁর জন্ম ১৯২২ সালে।

নজরুল চাঁদসড়কে আসেন ১৯২৬ সালে। অর্থাৎ বদরুদ্দিন সাহেবের বয়স তখন মাত্র চার বৎসর। শিশু। ফলে নজরুল সম্পর্কে তাঁর বলার মতো কোন ধারণা নেই বলে আমাকে জানালেন। তবে চাঁদসড়কের যে বিবরণ মৃত্যুক্ষুধায় আছে তাকে অতি বাস্তবসম্মত বলে মন্তব্য করলেন।

কৃষ্ণনগরে আরেকজন ছিলেন সনৎ (ভন্টু) মুখোপাধ্যায়। নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি নজরুল সঙ্গীত গাইতেন। নজরুল সম্পর্কে তাঁর অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, একথা শহরের অনেকেই বলতেন এবং বলেন। সেই মতো একদিন শিবরাম গুপ্তর দোকানে বসে ভন্টুবাবুর কাছে এ বিষয়ে কিছু জানতে চেয়েছিলাম। উত্তরে তিনি বলেছিলেন 'আমার স্মৃতিকথা কলকাতার একজন প্রফেসর লিখছেন।' এর ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আর জানা সম্ভব হয়নি।

পাঁচ

কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে এসে প্রথমে উঠেছিলেন গোয়াড়ির গোলাপটিতে মদন সরকার লেনের একটি বাড়িতে। মদন সরকার ছিলেন হেমন্তকুমার সরকারের বাবা। হেমন্তকুমারদের বাড়ির পাশেই ছিল সেই বাড়ি, যেখানে নজরুল উঠেছিলেন। সে বাড়িটি আজও আছে। এখন সে বাড়ির মালিক সাংবাদিক নির্মল দত্তদের পরিবার। ওঁর ছোট ভাই কমল দত্তর অংশ। নজরুল এই বাড়িতে কয়েক মাস ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাসে। এ প্রসঙ্গে মুজফফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন: আমি যতটা হিসাব করতে পারছি তাতে ১৯২৬ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে নজরুল ইসলাম হুগলী ছেড়েছিল এবং সেই দিনই অল্প ক'ঘণ্টার ভিতরে সে কৃষ্ণনগরে পৌঁছে গিয়েছিল।[১৩]

কিন্তু চাঁদসড়কে নজরুলের নিকট প্রতিবেশী এস. এম. আকবর-উদ্দীন লিখেছেন:

এই হিসেবে কিঞ্চিৎ ভুল আছে। ১৯২৫ সালের শেষ দিকে নজরুল হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে বাস করতে এসেছিলেন। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে কলকাতায় চলে যান।[১৪]

অবশ্য এর পরেই তিনি লিখেছেন: আজ প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। দিন তারিখ মাসগুলো স্মৃতির লেখা থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

এ বিষয়ে আজ নিশ্চিত কথা বলা মুস্কিল। দু'টো মতই তাই উল্লেখ করা গেল। হেমন্তকুমার সরকারই নজরুলকে কৃষ্ণনগরে এনেছিলেন। আনার কারণ হুগলীতে নজরুল এবং তাঁর পরিবার নানা-ভাবে অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। প্রধান অসুবিধা আর্থিক সমস্যা। নজরুলের শরীর ভালো যাচ্ছিল না। তার ওপর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। হেমন্তকুমার তাঁকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এলেন সংকট থেকে রক্ষা করতে। হেমন্তকুমার সরকার তখন ছিলেন কৃষ্ণনগরের জনপ্রিয় নেতা। যুবসমাজের আস্থাভাজন। তিনি নিয়ে এলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলকে। কৃষ্ণনগরের যুব সমাজ উল্লসিত। হেমন্তকুমারের পক্ষে নজরুলকে ও তাঁর পরিবারকে সর্বদা দেখভাল করা সম্ভব নয়। সে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন কৃষ্ণনগরের যুব সমাজ। তখন কৃষ্ণনগরের যুব সমাজের নেতা তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশেই যুবকরা এই সেবাকর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। আমার বড় মামা (শিবেন্দ্রনাথ ঘোষ—নদীয়া জেলাবোর্ডের কর্মী ছিলেন) তখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র এবং সৎকার সমিতি ও দরিদ্র ভাণ্ডার সংস্থার স্বেচ্ছাসেবী। তাঁর ওপরেও একটি দায়িত্ব বর্তেছিল। তাঁর ভাষায়—'কর্তার (তারক-দাসের) হুকুম হলো—তুমি কাজীর বাড়ির বাজার সরকার হও। তাই হলাম।' মামার কাজ হলো রোজ সকালে কাজীর বাসায় যাওয়া। গিয়ে জিজ্ঞেস করা, কি দরকার আছে বলুন। কাজী বারন্দায় টেবিল চেয়ার পেতে বসে লেখাপড়া করতেন। মামা গেলে তিনি বলতেন, ভিতরে যাও। মামা ভিতরে গিয়ে গিরিবালা দেবীর সামনে দাঁড়াতেন। গিরিবালা দেবী তাঁর হাতে বাজারের ফর্দ দিতেন।

টাকাও দিতেন। এক একদিন হাতে টাকা না থাকলে, বলতেন, জামাই-এর কাছ থেকে নাও। মামা নীচে এসে কাজীর সামনে দাঁড়াতেন। কাজী টাকা দিতেন। মামা বাজার করতে যেতেন। ফর্দ মতো বাজার করে এনে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতেন। একদিন গিরিবালা দেবী ফর্দ দিলেন। তাতে বাজারের অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেদিন একটি উনুনের কথাও ছিল। সেদিনও গিরিবালা দেবী জামাই-এর কাছে যেতে বললেন মামাকে। মামা গেলেন। কাজীকে ফর্দ দেখালেন। কাজী একবার মামার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর জামার দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের কাপড় বার করে দেখিয়ে বললেন, কিচ্ছু নেই। তুমি বাড়ি যাও ভাই। আজ বাজার থাক।

মামা পথে নেমে এলেন, ফর্দ হাতে নিয়ে। পুব দিকে খানিক গেলেই হাইস্ট্রিট—এখন তার নাম ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড। সেখানে তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়লার দোকান ছিল। স্বেচ্ছা-সেবীরাই সে দোকান চালাতেন। মামা দোকানে গিয়ে ফর্দ দেখালেন। তখন দোকানে যিনি ছিলেন, তিনি ফর্দ দেখে প্রয়োজন মতো টাকা দিয়ে, খাতায় টুকে রাখলেন। মামা টাকা নিয়ে বাজার করে পৌঁছে দিলেন কাজীর বাসায়। তারকদাসের এই রকমই নির্দেশ ছিল। কয়লার দোকানের লভ্যাংশের একটি অংশ এই রকম খয়রাতিতেই খরচ হতো। খয়রাতির খাতায় নজরুলের নামে একটি পাতা ছিল।

মামা তাঁর এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন এবং আমি সেটা কলকাতার 'প্রবর্তক' পত্রিকায় ছাপিয়ে দিয়েছিলাম। পত্রিকার সে সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে না থাকায় এবং মামার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বাড়িতেও না মেলায় ব্যবহার করা গেল না। মামার এই বক্তব্য আরও কয়েকজনের কাছে যাচাই করেছিলাম। তাঁরাও স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন সেসময় এবং কয়লার দোকানে বেচাকেনা করতেন। এঁদের ভিতর একজন ছিলেন খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তিনি আমার বাবার কলেজ জীবনের সহপাঠী ছিলেন। তিনি আবার অনন্তহরি মিত্রর গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্যও ছিলেন। সেক্ষেত্রে ছিলেন প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তর

সহকর্মী। পরবর্তী জীবনে তিনি শিক্ষকতা করতেন। প্রথম জীবনে ছিলেন মহেশগঞ্জ মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শেষ জীবনে ছিলেন বড় আন্দুলিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক। সেই খগেন কাকা আমাকে বলেছিলেন, কয়লার দোকানে খয়রাতি খাতায় কাজীর নামে একটি পাতা ছিল। তোমার বড় মামা নিজে কাজীর বাজার হাট করে দিত।

কাজী কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন অসুস্থ দশায়। এখানে আসার পর তাঁর ভালোভাবে চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। মামাকে ডাক্তারখানা থেকে কবির জন্য ওষুধও এনে দিতে হতো। তখন দোকানের মোড়ক করা ওষুধের চল ছিল না। ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার ওষুধ তৈরী করে দিতেন। সেখানে ভীড় জমত। ওষুধ পেতে অনেক দেরী হতো, দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। এক একদিন এতো দেরী হতো যে মামার আর কলেজ যাওয়া হতো না। গোয়াড়ির যুবকরা সেদিন এভাবেই সেবা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের।

নজরুলের চিকিৎসা প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

আমি আগেই বলেছি যে নজরুলের সেই প্রচণ্ড ম্যালোরিয়ার জের তখনও চলছিল। কৃষ্ণনগরে তার চিকিৎসার ভার নিলেন ডাক্তার জে. এন. দে। তিনি একজন ইংল্যাণ্ডে পাশ করা ডাক্তার ছিলেন এবং জাতিতে ছিলেন খ্রীষ্টান। অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত তিনি চিকিৎসা করে নজরুলকে নিরাময় করে তুলেছিলেন।[১৫]

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ আরও লিখেছেন. কৃষ্ণনগরের ছাত্ররাও নজরুলকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দপদ দত্ত, শ্রীপ্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত ও আরও অনেককে আমি দেখেছি।[১৬]

এই সময়ে কৃষ্ণনগরে নজরুলের দিন কেমন কাটছিল সে সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন :

মে মাসে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন) হবে স্থির হয়েছিল। সেই সময়ে

কৃষ্ণনগরে যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন হতে যাচ্ছিল। এই সবের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।[১৭]

আবার একজায়গায় লিখছেন, ...কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের দিনগুলি কাজে ভরা। এতটুকু অবকাশ ছিল না তার।[১৮] এরপর আবারও তিনি লিখেছেন: আমি নিজেও তখন কৃষ্ণনগরে উপস্থিত ছিলাম, থাকতামও নজরুলের বাড়ীতেই, কিন্তু তার ওপরে এত বেশী দায়িত্ব চাপানো ছিল যে সে কখন বাড়াতে আসত আর কখন চলে যেত তার টের পাওয়া যেত না।[১৯]

এই সকল বিবরণ থেকে স্পষ্টই ধারণা করা যায় যে কৃষ্ণনগরের যুবকরা সেদিন নজরুলকে কতো সাহায্য সহযোগিতা দান করেছিলেন। ব্যস্ত নজরুলের সাংসারিক প্রয়োজন—বাজার হাট—সব কিছুই করতেন এই যুবকরা। নিঃসন্দেহে কৃষ্ণনগর যুবসমাজের গৌরবময় ভূমিকা এটা। হেমন্তকুমার সরকার কৃষ্ণনগরে এনেছিলেন নজরুলকে এবং এই যুবকরাই নজরুলকে দেখাশোনা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে বলতেই হয়, এই যুব শক্তির ভরসাতেই হেমন্তকুমার অতোবড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

অসুস্থ নজরুলের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিলেন গোয়াড়ির গোলাপটি নিবাসী একজন সুযোগ্য চিকিৎসক। অনেকে তাঁর নাম লিখেছেন, ডাঃ জে. এন. দে। শ্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন, ডাক্তার বাবুর নাম ছিল, এন. এন. দে। তাঁর ছেলেমেয়ের সঙ্গে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখনও যোগাযোগ আছে। সেকালেও এঁদের পরিবারের সঙ্গে ডাক্তারবাবুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন, ডাক্তারবাবু বিলাত থেকে পাস করেছিলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। শুধু সেই কারণেই নজরুলের চিকিৎসার ভার তাঁর ওপর দেওয়া হয়নি। আরও দুটি কারণ ছিল। একটি কারণ হচ্ছে রোগী এবং চিকিৎসক—দুজনেই গোলাপটিবাসী। ফলে দেখাশোনা ও খবরাখবর নেওয়ার সুবিধা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ডাক্তার দে ছিলেন জাতীয়তাবাদী। কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের সমর্থক। ফলে বিশেষ

সহানুভূতির সঙ্গে নজরুলকে দেখবেন, এই প্রত্যাশা। হয়তো নজরুলকে দেখে পারিশ্রমিকও নিতেন না। তাঁর চিকিৎসাতেই কবি নিরাময় হয়েছিলেন।

এই ডাক্তার এন. এন. দে-র মৃত্যু হলে শহরের যুবকরা গোরস্থান অবধি শবানুগমন করেছিলেন। ডাঃ দে ছিলেন প্রটেস্টাণ্ট খৃষ্টান। কাজী নজরুল ইসলাম সেদিন যে-কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন তার একটি রূপ এ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ছয়

কৃষ্ণনগরের যুবকরা যেমন কাজীকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন, তেমনি কাজীকে তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছিলেন।

বড় মামার কাছে শুনেছি, নতুন গান লেখা হলেই কাজী বলতেন, বিকালে মাঠে যেও ভাই, গান শোনাব।

বিকালে গোয়াড়ির টাউন হলের মাঠে যুবকরা জড়ো হতেন। কাজী আসতেন। মাঠে একটা টেবিল আনা হতো। তার ওপর হারমোনিয়ম রেখে কাজী দাঁড়িয়ে গান ধরতেন। যুবকরা তাঁকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে গান শুনতেন। এবং সে গান শুনে আবেগে ভরে উঠতেন। কী গান—কী গলা—কী আবেগ। এই স্মৃতিচারণা করতে করতে বৃদ্ধ বয়সেও বড় মামার কণ্ঠ আবেগমত্ত হয়ে উঠত দেখতাম। নজরুল এঁদের কী ভাবেই না প্রভাবিত করেছিলেন সেদিন।

গোলাপটি পাড়ার প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী অনিলকুমার চক্রবর্তী ভালো গায়ক ছিলেন। নজরুলের কৃষ্ণনগর বাসকালে তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। তবু তিনি নজরুলের সঙ্গে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ সেই স্কুল জীবন থেকেই তিনি স্বদেশীদলভুক্ত ছিলেন। তখনকার এ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্য ছিলেন, বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠিত 'সাধনা লাইব্রেরী'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই

লাইব্রেরীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। স্বাধীনোত্তরকালে অনিলদা ধুবুলিয়া উদ্বাস্তু শিবিরে চাকরী করতেন। সেখানে কিছুকাল তাঁর সহকর্মী ছিলাম। এই সময় তাঁর মুখে কাজী নজরুলের কথা খুব শুনতাম। নজরুলের জাতীয়তাবাদী গানও শোনাতেন তিনি উদাত্ত কণ্ঠে। তারপর বলতেন, ঠিক হয়না, বুঝলে। কাজীদার মতন গাওয়া যায় না। সে গান যদি শুনতে। অমন গলা আর ব্যক্তিত্ব পাব কোথায়? এসময় অনিলদা একদিনের একটি অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনিয়েছিলেন। সেসময় যুবকদের যেমন এ্যাথলেটিক ক্লাব ছিল, তেমনি একটা রোয়িং ক্লাব (নৌচালন শিক্ষণ) ছিল। অনিলদাও তার সদস্য ছিলেন। ক্লাবের সদস্যরা প্রায়ই বিকালে নৌকা নিয়ে নদীতে জলবিহার করতেন। একদিন তাঁরা নজরুলকে সঙ্গে নিলেন। শান্ত জলঙ্গী নদী কুলুকুলু স্বরে বহে চলেছে। চারদিকে বিকালের শান্ত প্রকৃতি। নৌকা চলেছে স্রোতের অনুকূলে পুব থেকে পশ্চিমে, ধীর মন্থর গতিতে। পশ্চিমাকাশে অস্তমান সূর্য। তার রক্তাভা ছড়িয়ে পড়েছে নদীর জলে। ম্লান বিষণ্ণ সন্ধ্যা নেমে আসছে। এইসময় নৌকার মাঝখানে বসে কাজী গান ধরলেন। 'কাণ্ডারি হুঁশিয়ার' গানটি। এক সময় গেয়ে উঠলেন:

কাণ্ডারী! তা সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর।
বাঙালীর খুনে লাল হলো যেথা ক্লাইভের খঞ্জর॥
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার॥
ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান।
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান॥

অনিলদা বললেন, সেই পরিবেশে কাজীদার কণ্ঠে ওই গান শুনে আমাদের মনে সে কী রোমাঞ্চ শিহরণ। সূর্যাস্তের আলোয় লাল হয়ে যাওয়া নদীর জলকে মনে হতে লাগল, বুঝি সত্যিই পলাশীর যুদ্ধে নিহত সৈনিকের রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছে এই নদী জল। সত্যিই বুঝি শহীদরা আমাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অবিস্মরণীয় সে সন্ধ্যা। সত্যিই নজরুল এক অসামান্য প্রতিভা। তাঁর সাহচর্য লাভ আমার

জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

নজরুল ইসলাম গোয়াড়ির টাউন হলে মাঝে মাঝে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। শ্রোতা সমাগমে ঘর ভরে যেত। সে-সময় কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পৈতৃক বাড়ি কৃষ্ণনগরের মাঝের পাড়ায়। তিনি থাকতেন গোলাপটিতে নিজের বাড়িতে। তিনি ভালো আবৃত্তি করতেন। কলেজে ছাত্রদের তিনি আবৃত্তি শিক্ষা দিতেন। তাঁর কাছে আবৃত্তি শিখে ছাত্ররা নানা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে বিজয়-মাল্য নিয়ে আসতেন। এই ভবেশবাবুর খুব ইচ্ছা নজরুলের আবৃত্তি শোনার। একদিন তিনি টিউটোরিয়াল ক্লাশে ছাত্রদের বললেন, কাজী বলে খুব ভালো আবৃত্তি করে। তোমরা শুনেছ?

ছাত্ররা বললেন, হ্যাঁ স্যার, দারুণ। আপনি একদিন যান, শুনে আসুন। অধ্যাপক বললেন, যেতে তো ইচ্ছে করে। কিন্তু সরকারি চাকরি করি। কাজীর সভায় যে পুলিশের চর থাকে।

নজরুল একদিন 'আগমনী' আবৃত্তি করলেন। পরদিন ক্লাশে এসে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, হ্যাঁ, আবৃত্তি বটে। যেমন লেখা তেমন বলা।

স্যার, আপনি গিয়েছিলেন,

হ্যাঁ, লোভ সামলাতে পারলাম না আর। পিছন দিকে ভীড়ের মধ্যে মাথা লুকিয়ে ছিলাম। না গেলে ঠকতাম।

এ বিবরণটি বাবার মুখে শুনেছিলাম। ভবেশচন্দ্র তাঁর অধ্যাপক ছিলেন। আরেকটি গল্পও শুনেছিলাম বাবার কাছেই।

কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায় কৃষ্ণনগরে এলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তখন তাঁর বিপুল খ্যাতি। তিনি কৃষ্ণনগরের ছেলে। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পৌত্র। তাঁকে নিয়ে কৃষ্ণনগরবাসীরা বিশেষ গৌরববোধ করতেন। তাঁর সম্মানার্থে সঙ্গীতের একটি আসর বসল। সে আসরে দিলীপকুমার ছিলেন, নজরুল ইসলাম ছিলেন, হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (এখনকার দ্বিজেন্দ্রসঙ্গীত গায়িকা কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়ের

পিতৃদেব) ছিলেন, সুগায়ক কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন। সবাই গেয়েছিলেন। কিন্তু যুবক শ্রোতার দল শুধু কাজীর গান শুনতে চান। দিলীপকুমার হারমোনিয়ম ধরলেই যুবকদের চীৎকার—কাজীদার গান হোক—কাজীদার গান—

কাজী যুবকদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানাতেথাকলেন, ভাই আমিতো আছিই। পরেও শুনতে পাবে আমার গান। দিলীপদা এসেছেন, বড় গায়ক, তিনি আমাদের গৌরব, আজ তাঁর গান আমরা সবাই শুনি। কিন্তু যুবকরা সে কথা শুনতে নারাজ। শেষে দিলীপকুমার ক্ষুণ্নভাবে বলে উঠলেন, কাজী এ তোমার আসর, তুমিই গাও। আসলে এটা ছিল যুগের হাওয়া। নিছক কাজীপ্রীতি নয়। বিপ্লবমনস্ক যুবকরা তখন দেশাত্মবোধক গান ছাড়া অন্য গানকে মনের সঙ্গে মানতে পারছেন না।

'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে এসে নজরুল বাঙলা ভাষায় গজল গান লিখতে শুরু করলেন। সে গানও মজিয়ে দিয়েছিল কৃষ্ণনগরকে। শহরে তখন রিক্সার চল ছিল না। ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ী চলত। সেই গাড়ীর কচুয়ানরা (কোচম্যান) লুফে নিল এই গজল গানকে। তারা গাড়ী চালাতে চালাতে হাতের চাবুকটা শূন্যে ঘুরিয়ে বাতাসে শিখ্ তুলে তার তালে তালে গাইতে লাগল :

বাগিচায় বুলবুলি তুই
ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল
আজো তার ফুল কলিদের
ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল।

শহরের যুবকরা তখন গাইছেন :

লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দীশালায় আগুন জ্বালা।

এসব বিবরণ শুনেছি অনিলদার মুখেই। এই সব বিবরণ থেকে বোঝা যায় কাজী নজরুল ইসলাম-এর সৃষ্টিশীল প্রতিভা সেদিন কৃষ্ণনগরবাসীকে কতো গভীর ও নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

সাত

নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে। তখন তাঁর যেমন চিকিৎসা শুরু হয়েছিল তেমন বিশ্রামও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রয়োজনীয় সে বিশ্রাম তাঁর মিলল না।

১৯২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে কয়েকটি প্রাদেশিক সম্মেলন হয়েছিল। নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন, প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলন, প্রাদেশিক যুব সম্মেলন এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলন।

নজরুল ইসলাম সবকটি সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটি বা অভ্যর্থনা সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন। ফলে বিশ্রাম মেলেনি। এই সব সম্মেলনকে সফল করে তুলতে তিনি যথাসাধ্য শ্রমদান করলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনই ছিল তখন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সেদিকেই সকলের নজর ছিল বেশি। সেই অধিবেশনকে সবিশেষ মর্যাদাময় ও সুশৃঙ্খল করা ছিল বিশেষ লক্ষ্য। শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিশেষ প্রয়োজন। সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। সামরিক বাহিনীতে তিনি হাবিলদারের পদে কাজ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষ্ণনগরের যুবকদের কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিয়ে সামরিক কায়দায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত। শ্রীসেনগুপ্ত তখন কৃষ্ণনগর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বয়স হবে ১৯।২০ বছর। নজরুল ইসলামের বয়স তখন সাতাশ বছর। সেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন নজরুল ইসলাম স্বয়ং। সহ-অধিনায়ক প্রমোদরঞ্জন। এই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী শুধু জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনেই শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করেনি, সব কটি সম্মেলনেই যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল। এটি নজরুলের বিশেষ কৃতিত্ব কথা। তিনি শুধু কবিই নন, তিনি এই

কর্মক্ষেত্রেও তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেকালের প্রত্যক্ষদর্শী একালের অনেক প্রবীণ ব্যক্তির স্মৃতিতেই নজরুলের এই কুচকাওয়াজ শিক্ষাদান ও বাহিনী পরিচালনার দৃশ্য উজ্জ্বল হয়ে আছে। সেই প্রত্যক্ষদর্শীদের ভিতর শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। সেই সব সম্মেলনে নজরুল কবির ভূমিকাও পালন করেছিলেন সগৌরবে। প্রতিটি সম্মেলনেই তিনি উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন। সেসব গান ছিল তাঁরই রচিত।

সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন। এটা হয়েছিল ১৯২৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। বাংলার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। সভাপতি ছিলেন শামসুদ্দিন আহমদ। তিনি ছিলেন কুষ্টিয়ার মানুষ। তখন ওকালতি করতেন কৃষ্ণনগরে। পরে অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে নজরুল ইসলাম যে উদ্বোধন সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন, তার নাম 'শ্রমিকের গান'। গানটির সূচনা অংশ হচ্ছে—

ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।
হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল।

এই সম্মেলনটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ :

'শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলন সবই তখন কংগ্রেসের ছত্রছায়াতলে চলত। কিন্তু কৃষ্ণনগরের এই নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনেই প্রথম শ্রমিক আন্দোলনকে কংগ্রেসের কব্জা থেকে মুক্ত করে 'দি ওয়ার্কার্স এ্যাণ্ড পেজেন্টস পার্টি' নাম দিয়ে ব্যাপক সংগঠন তৈরী হয়।'[২০]

নিঃসন্দেহে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কৃষ্ণনগরের পক্ষে তো বটেই। আর 'নজরুল এই পার্টির কার্যকরী সমিতির সভ্য হয়েছিলেন।'[২১]

নজরুলের ক্ষেত্রে এটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। বিদ্রোহী ও বিপ্লবীর ভূমিকা থেকে সরে এসে তিনি সাম্যবাদী চিন্তায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আগে থেকেই। কৃষ্ণনগরে আসবার আগে কলকাতায় তিনি 'লাঙল' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। ওই সাপ্তাহিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন মুজফফর আহ্‌মদ এবং হেমন্তকুমার সরকার। এঁরা কৃষক আন্দোলনকে প্রসারিত করছিলেন। নজরুল ছিলেন এঁদেরই সহযোগী। এর আগের বছর এঁরা ধীবর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। নজরুল সেখানেও সম্মেলনে উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন। সেটা ছিল ধীবরের গান।

আমরা নীচে পড়ে রইবনা আর
শোনরে ও ভাই জেলে
এবার উঠব রে সব ঠেলে।

কাজেই নজরুল স্বাভাবিক কারণেই নবগঠিত সংস্থার কার্যকরী সমিতির সভ্য হয়েছিলেন।

স্বতন্ত্র শ্রমিক সংগঠনের কার্যকরী সমিতির মত হলেও নজরুল কংগ্রেস অধিবেশনের প্রস্তুতি পর্বের সাংগঠনিক কাজ থেকে সরে আসেন নি। তা আসার কারণও ছিল না। কারণ কংগ্রেস তখনও জাতীয় সংগঠন। এই কংগ্রেস অধিবেশনে মুজফফর আহমদও যোগ দিয়েছিলেন এবং তিনি চার আনার সদস্য হয়েছিলেন। একথা তিনি তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' বইতে উল্লেখ করেছেন।

প্রজা সম্মেলনের পর আরও তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যুব সম্মেলন, ছাত্র সম্মেলন এবং জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক কারও মতে দুটো সম্মেলন হয়েছিল। যুব সম্মেলন হয়নি, ছাত্র ও যুব মিলিয়ে একটি অধিবেশন হয়েছিল। এটি নজরুল জীবনীকার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত।[২২] তিনি সেই ছাত্র যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনটি ছিল মূলতঃ ছাত্র সম্মেলন। তাই নজরুল সেখানে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে লিখেছিলেন এবং গেয়েছিলেন ছাত্রদল গানটি—

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্র দল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান,
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

এই গানটি রচিত হয়েছিল কৃষ্ণনগরেই, তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সাল। এই ছাত্র যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল কৃষ্ণনগরের টাউন হল-এ। সভানেত্রী ছিলেন সরোজিনী নাইডু। তিনি তখন নিখিল ভারত কংগ্রেসেরও সভানেত্রী। এই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল।

'…কবি নজরুল এই সম্মেলনরও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক ও সভা উদ্বোধক ছিলেন।'[২৩]

কিন্তু এই সভা শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

'বক্তা বীরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় যুবকের দল অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাঁর উপর মারমুখো হয়ে উঠে। তখন কবি নজরুল ও সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁকে গোলমালের ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যান। সেই সময় দেখেছিলাম যুবকদের উপর কবির কি অপূর্ব প্রভাব।'[২৪]

এই সম্মেলনের পরই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিল। সেটা হয়েছিল কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির পুজোর দালানে। প্রতিনিধিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল কলেজিয়েট স্কুলে।

এই সম্মেলনই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে নজরুল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি গেয়েছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্যেই গানটি লেখা হয়েছিল। রচনার তারিখ: ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ সাল। সঙ্গীতটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং নজরুল প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

ছুলিতেছে তরী ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত ?
কে আছো জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।

এই গানের ভিতর তৎকালীন বাংলার রাজনীতির রূপই প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলনের পূর্ব বৎসরে—১৯২৫ সালের ১৫ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোকগমন করেন। ফলে বাংলার রাজনৈতিক জগতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবার মতো অবিসংবাদী নেতা কেউ ছিলেন না। দেশবন্ধুশূন্য বাংলায় তখন দুই প্রধান নেতা—যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষচন্দ্র। দুজনের মধ্যে প্রবল দলাদলি। এর পাশে বৃহৎ পঞ্চক (Big five) নামে একটি গোষ্ঠি তৃতীয় শক্তি হিসাবে বর্তমান। এই বৃহৎ পঞ্চক হচ্ছেন—নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, বাবু তুলসী গোস্বামী ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ত্রিধা বিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বস্তুতঃ বাংলার রাজনৈতিক জগতে মাৎস্যন্যায়ের পরিস্থিতি। এরই মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন। নজরুল তাঁর গানে এই পরিস্থিতিরই কাব্যিক বিবরণ দিয়েছেন।

আবার মে মাসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের ঠিক আগেই এপ্রিল মাসে কলকাতায় শুরু হয়ে যায় হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এ যেন গোদের ওপর বিষফোঁড়া। নজরুলকে তাই সেই প্রসঙ্গও আনতে হয়েছে ওই গানে।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী আজ। আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম' ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন ?
কাণ্ডারী বল 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার্।'

কতো বলিষ্ঠ উদার মানবিক আবেদন। কতো সতর্ক সচেতন সাবধান বাণী বা হুঁশিয়ারি নেতৃবৃন্দের প্রতি।

দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির কারণে এই সম্মেলন

হতে পারবে কিনা তাই নিয়েই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। যাইহোক শেষ অবধি অধিবেশন বসেছিল। বাংলার নানা প্রান্ত থেকে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবর্গ এবং কর্মীদল এসেছিলেন। সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। এবং সেই সভায় দাঁড়িয়ে নজরুল তাঁর রচিত এই মহাসঙ্গীত গেয়ে সভার উদ্বোধন করেছিলেন। 'কবি কাণ্ডারী হুঁশিয়ার গানটি বারংবার গেয়ে আবেদন জানালেন সকলকে।'[২৫]

কিন্তু কে সেই হুঁশিয়ারিতে কান দেবে? সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। গান শেষ হবার পর তিনি বলতে উঠে সন্ত্রাসবাদী যুবকদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা বলতেই সভায় গোলমাল শুরু হয়ে গেল। তাঁর বক্তৃতায় বাধা পড়তে পড়তে লাগল। শেষ অবধি শাসমলমশায় সভা ছেড়ে গেলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি যোগেশ-চন্দ্র চৌধুরীকে সভার কাজ চালিয়ে নেবার জন্য সভাপতিত্বে বরণ করলেন। তিনিও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। যতীন্দ্রমোহনও পারলেন না, সরোজিনী নাইডুও ব্যর্থ হলেন। 'দৈনিক নবযুগ পত্রিকার সম্পাদক মৌলানা আহমদ আলীও তাঁর সরস ভাষায় আবেদন করে গোলমালকারীদের শান্ত করতে পারলেন না। কোথা থেকে কি যে হ'ল, সম্মেলন ভেঙে তছনছ হয়ে গেল। শূন্য সভাস্থলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রইল ছাতা, রকমারি জুতো, লাঠি, গান্ধী টুপি প্রভৃতি।'[২৬]

দলাদলি, অন্তর্বিরোধের ফলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-এর কৃষ্ণ-নগর অধিবেশন এভাবেই ভেস্তে গেল। তবু এই অধিবেশন বঙ্গদেশের জাতীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলন থেকে স্বতন্ত্র পেজেন্টস এ্যাণ্ড ওয়ার্কাস পার্টির জন্ম হয়েছিল কৃষ্ণনগর সম্মেলনে। তেমনি এক ঘটনা ঘটল কংগ্রেস অধিবেশনে। এর আগের অধিবেশনে পূর্ব বৎসরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট' নামক এক প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন। দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বঙ্গদেশে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব চাকরী শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে শতকরা ষাট ভাগ সুযোগ তাদের জন্য সংরক্ষিত

থাকবে। এই সব প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে বঙ্গদেশে সম্প্রীতির-মিলনের হাওয়া বইবে। কৃষ্ণনগর অধিবেশন মাঝপথে ভেস্তে গেলে ওই হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট নাকচ হয়ে গেল। এটাই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ওই অধিবেশনের। স্বভাবতঃই বঙ্গের মুসলমান সমাজ এতে হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সে ইতিহাস-কথা এখানে আলোচনার বিষয় নয়। কিন্তু নজরুল ইসলামের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ছিল এ বিষয়ে? যতদূর জানা যায়, তিনি এই প্যাক্টের সমর্থক ছিলেন না। এ ভাবে চুক্তি করে, কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। চাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রীতি ভালোবাসা। তাই তিনি এই প্যাক্টকে পরিহাস করে কবিতা লিখেছিলেন।

বদনা গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আশনাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।

এই যে সম্মেলনগুলো হয়ে গেল—এর প্রত্যেকটিতেই নজরুল ইসলাম উদ্বোধন সঙ্গীত গেয়েছিলেন ; এবং প্রত্যেকটিই তাঁর স্বরচিত সঙ্গীত। শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদ তাঁর রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা' গ্রন্থে লিখেছেন চারটি সম্মেলন হয়েছিল এবং প্রত্যেকটির জন্যই উদ্বোধন সঙ্গীত রচিত হয়েছিল। শুধু যুব সম্মেলনে গাওয়া গান—

'চলরে চলরে চল
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল

নিম্নে উতলা ধরণী তল্' প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে এটি বিতর্কিত। কাদের জন্য লেখা হয়েছিল তা অমীমাংসিত। বর্ধমানের একটি অনুষ্ঠানের জন্য লেখা হয়েছিল বলে দাবী আছে। আবার ঢাকা থেকেও দাবী আছে যে সেখানকার একটি অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত। আবার প্রমোদরঞ্জন সেন এ বিষয়ে মুজফফর আহমদ সাহেবকে বলেছেন যে গানটি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়েছিল।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে যা লিখেছেন তাতে কৃষ্ণনগরে স্বতন্ত্র কোন যুব সম্মেলনই হয়নি। এবং

'চলরে চলরে চল্' গানটি ঢাকার একটি অনুষ্ঠানের জন্য রচিত হয়েছিল। প্রশ্ন হচ্ছে স্বতন্ত্র যুব সম্মেলন হয়েছিল কি? হয়ে থাকলে কোন্ গান গাওয়া হয়েছিল? এটি আজও অমীমাংসিত।

বাকী তিনটি গান :

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে—শ্রমিকের গানটি লেখা হয়েছিল এক বছর আগে। অর্থাৎ ১৯২৫ সালে।

তিনি লিখেছেন···'২০শে মাঘ 'শ্রমিকদের গান' লেখেন।' এবং 'নজরুল পরিচালিত 'সাপ্তাহিক লাঙলে'র ১২শ সংখ্যা, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩২ অর্থাৎ ১৯২৫ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত।'[২৭] তাহলে বাকী থাকছে দুটি গান। আমরা ছাত্রদল আর কাণ্ডারী হুঁশিয়ার। এ দুটি গান কৃষ্ণনগরেই লেখা হয়েছিল, কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত দুটি সম্মেলনের জন্য—এবিষয়ে আর দ্বিমত নেই।

কিন্তু 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি কি ভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এস. এম. আকবরউদ্দিন একটি বিবরণ দিয়েছেন তাঁর একটি নিবন্ধে। নিবন্ধটি স্মৃতিকথা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। এস. এম. আকবরউদ্দীন ছিলেন কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক পল্লীর অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় চলে যান। তাঁর পুত্র এস. এম. বদরুদ্দিন—বর্তমানে কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী। এস. এম. আকবরউদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

'বাড়ীর উত্তরদিকের ইঁদারা থেকে ৮/১০ গজ দূরে যে বোম্বাই আমগাছটা ছিল সেটার তলায় বসে নজরুল বহু কবিতা গান ও গজল লিখেছিলেন। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটি এই গাছতলাতেই বসে লেখা। গানটি রচনার কয়েক মিনিট পরেই আমি প্রায় নিত্যকারের মতো সেখানে গিয়েছিলাম। পড়ে শোনালেন; তারপর বাড়ীর বারান্দায় গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে হার্মোনিয়ম এনে সুর দিলেন, গেয়ে শোনালেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে এটা ছিল উদ্বোধন সঙ্গীত।'[২৮]

এটা স্মৃতিকথা বা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হলেও সর্ববাদীসম্মত নয়।

এই বিবরণ মতে, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার গানটি নজরুল রচনা করেছিলেন 'গ্রেস কটেজ' বাড়ির আমতলায় বসে। অর্থাৎ তখন তিনি গোলাপটির বাসা ছেড়ে চাঁদ সড়কের বাড়িতে উঠে এসেছেন। কিন্তু অন্য প্রত্যক্ষদর্শী মুজফফর আহমদ এবং প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ভিন্নকথা বলেছেন।

মুজফফর আহমদ লিখেছেন: 'সম্মেলন ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ি পেয়ে সেই বাড়িতে উঠে গেল। বাড়ীটা ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট বাড়ী হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগান বাড়ীও বলা যায়।'[২৯] এই বিবরণ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলন বা কংগ্রেস অধিবেশন হয়ে যাবার পর নজরুল বাসা বদল করেন। অর্থাৎ গোলাপটির বাসা ছেড়ে চাঁদ সড়কের গ্রেস কটেজে উঠে আসেন। আর কংগ্রেস অধিবেশনেরই উদ্বোধন সঙ্গীত ছিল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার। তাহলে গ্রেস কটেজের আমতলায় বসে 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' রচনা সম্ভব হয় কিভাবে? প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনে এবং নজরুলের গোলাপটির বাসা ঠিক হয়ে যাওয়ার জন্য আমি হুগলী থেকে রচনা হয়ে নৈহাটী স্টেশনে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মুজফফর আহমদ, কুতুবউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একসঙ্গে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলাম। সেখানে থেকেই নজরুলের সঙ্গে প্রাদেশিক সম্মেলনে গিয়েছিলাম।'[৩০]

এই বিবরণ জানাচ্ছে, লেখক এবং মুজফফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন সাহেব প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে কৃষ্ণনগরে এসে নজরুলের গোলাপটির বাসায় উঠেছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করেই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ সম্মেলন চলাকালে নজরুল ওই গোলাপটির বাড়িতেই ছিলেন। মুজফফর আহমদও তাঁর গ্রন্থে একথাই লিখেছেন। তাহলে 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি গোলাপটির বাড়িতে বসেই লেখা সম্ভব। গ্রেস কটেজের আমতলায় নয়। এবং ওই আমতলায় বসে আকবরউদ্দীন সাহেবকে গেয়ে শোনানও সম্ভব নয়। সে অবকাশও তখন

ছিল না কবির।

এস. এম. আকবরউদ্দীন, ওই গানটি সম্পর্কে আরও লিখেছেন: 'দিলীপ রায় এসে গানের সুর সামান্য একটু পরিবর্তন করেছিলেন, সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র ছিল হার্মোনিয়ম, ক্লারিওনেট ও একটা বিরাট ঢাক। দিলীপ রায় গানে লীড দিয়েছিলেন।'[৩১] এই বিষয়েও, অন্য দুজন প্রত্যক্ষদর্শী—মুজফফর আহমদ ও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় দিলীপ রায়ের এমন ভূমিকার কথা উল্লেখ করেননি। সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করলেও দিলীপ রায়ের মতো ব্যক্তির উপস্থিতির কথা লেখেননি। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: 'কবি 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি বার বার গেয়ে আবেদন জানালেন সকলকে। কিন্তু হায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তখনকার মত কাণ্ডারীশূন্য হয়েছিল বাংলা দেশ।'[৩২]

মুজফফর আহমদও প্রায় এইরকম কথাই বলেছেন।

আর নজরুলের স্বরচিত গানে, দিলীপকুমার রায় লীড দিয়েছেন কংগ্রেস অধিবেশনে গাইতে এসে—এটা ভাবতে কেমন অবাক লাগে।

যাই হোক, নজরুল ইসলাম জাতীয় সম্মেলনের জন্য ওই 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি রচনা করেছিলেন এবং সভায় গেয়েছিলেন—এটা ঠিকই। নদীয়া জেলার পলাশীর আমবাগানে একদা ভারতের ভাগ্য-রবি অস্তমিত হয়েছিল। সেদিন বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌল্লা এবং সেনাপতি মীরজাফরকে কেউ সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।

কিন্তু বাংলার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জাতির সংকটকালে বাংলার কবি নজরুল ইসলাম 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সঙ্গীত রচনা করে এবং সভায় গেয়ে জাতীয় নেতৃবর্গকে এবং দেশবাসীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। এটা কৃষ্ণনগর, নজরুল ইসলাম এবং জাতীয় ইতিহাসের কাছে আজ গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহাসিক ঘটনা।

আট

১৯২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত সম্মেলনগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল

একের পর এক। এই সব সম্মেলনের পালা চুকলে নজরুল ইসলাম বাসা বদল করেন। হেমন্তকুমার সরকারদের বাড়ি ছিল গোলাপটিতে মদন সরকার লেনে। সেই বাড়ির পাশেই একটি ভাড়াবাড়িতে নজরুল থাকতেন। সে বাড়ি এবং পাড়া ছেড়ে তিনি চলে গেলেন বেশ অনেকটা দূরেই চাঁদসড়ক পল্লীর 'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে। ভাড়াটিয়া বাসা বদল করতেই পারেন। কিন্তু নজরুল ইসলাম তো তেমন ভাড়াটিয়া ছিলেন না। তাঁকে কৃষ্ণনগরে এনে হেমন্তকুমার সরকার নিজেদের বাড়ির পাশে আশ্রিত করেছিলেন।

'হেমন্তবাবুর মাতা নীরদবরণী দেবী নজরুল ও তাঁর পরিবারের লোককে মায়ের মত ব্যবহার দিয়ে অভ্যর্থনা করে তাঁর বাড়িতে বরণ করে নিলেন। তারপর তারই গোলাপটির বাড়িতে কবিকে আশ্রয় দিলেন। শুনেছি কবিকে ঐ বাড়ির ভাড়াও দিতে হত না। খাবার খরচাও সরকার বাড়ি থেকে সরবরাহ করা হত।'[৩৩]

তাহলে এই বাসা ও পল্লী কবি ত্যাগ করলেন কেন?

কবির এই বাসা বদল নিয়ে নানা গুঞ্জন প্রচারিত আছে। তা থেকেই মনে নানা প্রশ্ন জাগে।

মুজফফর আহমদ সাহেব লিখেছেন: 'সম্মেলন ইত্যাদির ঝামেলা মিটে যাওয়ার পরে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে একটি ভালো বাড়ি পেয়ে সেই বাড়িতে উঠে গেল।'[৩৪]

শিবরাম গুপ্ত আমাকে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় গোলাপটির বাড়িটা ছিল পথের ধারে, জনবহুল স্থানে। কবির পক্ষে বসবাসের ঠিক উপযুক্ত ছিল না। গ্রেস কটেজ ছিল সেক্ষেত্রে খুবই উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয়। কাজী তাই গোলাপটির বাসা ছেড়ে গ্রেস কটেজ বাড়িতে গিয়েছিলেন।'

কিন্তু এস এম. আকবরউদ্দীন লিখেছেন: 'প্রথমে তিনি ওঠেন হেমন্তকুমারের ভাই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র সরকারের গোয়াড়ীর বাড়ীতে। বাড়ীটা ছিল মদন সরকারের গলিতে অত্যন্ত ঘিঞ্জি জায়গায়। আশেপাশে সবাই অত্যন্ত রক্ষণশীল হিন্দু—যদিও

তাঁরা ও তাঁদের ঘরের মেয়েরা নজরুলের গান শোনার জন্য এই বাড়ীতে ভীড় জমাতেন। শেষে চাঁদ সড়কের এই মুক্ত বাড়ীতে এসে নজরুল যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।'[৩৫]

আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন: 'কৃষ্ণনগর জায়গাটা একটু অদ্ভুত বললেও চলে। ওখানকার লোক দাবী করতো তারা প্রগতিবাদী মডার্ন; কিন্তু আসলে ছিল রক্ষণশীল। নজরুলের চাঁদ সড়কের বাড়ীতে কখনো মহিলাদের ভিড় দূরে থাক, দুচার জনকেও জমায়েত দেখিনি। এমনকি পুরুষদের মধ্যেও খুব সংখ্যক লোক আসতেন।'[৩৬]

এই বিবরণের পর আর ভাবা যায় না যে নজরুল ইসলাম খোলামেলা পরিবেশ ও কবিকুঞ্জের মতো বাড়ি পেয়ে মুসলমান পল্লী চাঁদসড়কের 'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে উঠে এসেছিলেন। মনে প্রশ্ন জাগেই—কি সেই কারণ যার জন্য তিনি গোলাপটির বাড়ি ত্যাগ করলেন?

চাঁদ সড়ক পল্লীর গফুরন্নেসা বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা আগেই জানানো হয়েছে। সেই সময় তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'কাজীদা এপাড়ায় এলে আকবর কাকা এবং তাঁর ভাই জহর কাকা কাজীদার শাশুড়ী গিরিবালা দেবীকে বলতেন, এবার কী হবে? আপনি মরলে আমরা কবর দেব। গিরিবালা দেবী বলতেন, আমার চিন্তা নেই। জ্ঞান সরকারের বউ আছে। সে-ই সব ব্যবস্থা করবে।'

এসবই ঠাট্টা—নির্দোষ রসিকতা বলে মনে হতো, যদি আমার মাসীমার কথা মনে না পড়ত। নজরুল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি যেন এমন একটা ইঙ্গিতই দিতেন। কাজী নজরুল গোলাপটির পাড়ায় থাকার সময় নাকি পাড়ার হিন্দু মহিলারা গুঞ্জন তুলেছিলেন যে মেয়ের বিয়ে না হয় মুসলমানের সঙ্গে দিয়েছে, তাই বলে হিন্দু বিধবা মহিলা মুসলমান জামাই-এর সংসারে থাকে কোন আক্কেলে? আবার হিন্দুয়ানি ফলায়? ওর আবার জাত আছে নাকি?

চাঁদসড়ক পাড়ার ওই রসিকতা কি গোলাপটির গুঞ্জনের জবাব? গুঞ্জন ও রসিকতায় অদ্ভুত মিল এবং তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুরা তাড়িয়েছে। মুসলমান ছাড়া গতি নেই আর, মরলে কবর হবে। অর্থাৎ গিরিবালা

দেবীর জাত গিয়েছে। নজরুল কি তবে শাশুড়ী বিপন্ন হওয়ার কারণে গোলাপটির ছেড়ে ছিলেন? চাঁদ সড়কে চলে এসেছিলেন?

এস. এম. আকবরউদ্দীন তাঁর ওই নিবন্ধের একস্থানে লিখেছেন যে নজরুলকে রক্ষণশীল হিন্দু এবং সম্ভ্রান্ত এমনকি শিক্ষিত মুসলমানরাও সুনজরে দেখত না। তাই কি নজরুল কৃষ্ণনগরে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান পল্লী থাকা সত্বেও সেখানে না গিয়ে হতদরিদ্র অবহেলিত মুসলমান পল্লী চাঁদ সড়কে বাসা নিয়েছিলেন?

বাসাটি কিন্তু সুন্দর ছিল। এবং সেটা ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেটা তখন এমন একটা বাড়ি—যেটা চাঁদ সড়কে হলেও বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো—বাগানবাড়ি। সেখানে হিন্দু মুসলমান দু'পক্ষেরই ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে থাকা সম্ভব। আর সে কারণেই গিরিবালাদেবী বলতে পারছেন যে 'জ্ঞান সরকারের বউ আছে, সে-ই সব ব্যবস্থা করবে।'

জ্ঞান সরকার ছিলেন হেমন্তকুমারের দাদা। তৎকালীন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক। গোলাপটিতে বাসকালে গিরিবালা দেবী এঁদের সাহায্য সহযোগিতার ওপর বিশেষ নির্ভরশীল ছিলেন। গিরিবালা দেবী নজরুলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেও তিনি নিজে হিন্দু সংস্কারই মনে পোষণ করতেন। মুসলমান জামাই-এর বাড়িতে থেকেও তিনি হিন্দু বিধবার রীতিনীতি, আচারই পালন করতেন। তাঁর এই হিন্দু বিধবার মানসিকতা কলকাতায় গিয়ে প্রবল হয়েছিল। মুজফফর আহমদ লিখেছেন: 'তিনি কঠোরভাবে একাদশীর উপবাস করতেন, গঙ্গাস্নান করতে যেতেন ইত্যাদি। সেই গঙ্গা স্নানের জন্যই তিনি উত্তর কলকাতা ছাড়তে চাইতেন না।'[৩৭]

কবি জসীমউদ্দীন গিরিবালা দেবীকে খালা আম্মা বলতেন। কবি দম্পতি যখন রোগশয্যায় তখন এক দুপুরে জসীমউদ্দীন সেখানে গেলে গিরিবালা দেবী কি করেছিলেন তার একটি বিবরণ দিয়েছেন তাঁর 'ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়' গ্রন্থে। সেই বিবরণের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে মুজফফর আহমদের গ্রন্থে। সেটা হচ্ছে: 'খালা আম্মা আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম

পায়খানা করিয়া কাপড় জামা সমস্ত অপরিষ্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালা আম্মা বলিলেন, এই সব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি হিন্দু বিধবা তবে রান্না করতে বসব। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে।'[৩৮]

গিরিবালা দেবীর এই হিন্দু বিধবার মানসিকতাই তাঁকে কৃষ্ণনগরে সেদিন বিপন্ন করেছিল। তাঁকে সেই বিপন্নতা থেকে রক্ষা করতেই কি নজরুল ইসলাম বাসা বদল করেছিলেন ?

এস. এম. আকবরউদ্দীন তাঁর নিবন্ধে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে মনে হয় যে নজরুল ইসলাম মুসলমান বলেই গোলাপটির হিন্দু পাড়ায় থাকতে পারেননি। অর্থাৎ হিন্দুরা সেটা পছন্দ করেননি।

এ প্রসঙ্গে শ্রী স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগরের স্বাধীনতা সংগ্রামী সাংবাদিক ও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী) অন্য পত্র নামে স্থানীয় একটি পত্রিকায় লিখেছেন, 'কেউ কেউ বলেন যে কাজী হিন্দু পাড়ায় থাকতে না পেরে মুসলমান পাড়ায় উঠে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়।'[৩৯]

সত্যিই এটা ঠিক নয়। গোয়াড়ীতে সেকালে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতে অভ্যস্ত ছিল। নজরুল গোলাপটির যে বাড়িতে বাস করেছিলেন, পরবর্তীকালে সে বাড়িতে একজন মুসলমানই বাস করতেন। তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। গোয়াড়ি বাজারে তাঁর কাপড়ের দোকান ছিল। দোকানের নাম ছিল শান্তিপুর বস্ত্রালয়। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্থানে চলে যান। এবং ওই বাড়িটি তিনি বিনিময় করেন। কৃষ্ণনগরের সাংবাদিক নির্মল দত্তদের ভেড়া-মারার (বাংলাদেশ) বাড়ির সঙ্গে বিনিময় হয়। বাড়িটি এখন ওই দত্তদের ছোট ভাই কমল দত্তর পরিবারে অধিকারে। ওঁরা বাড়িটার নাম দিয়েছেন 'বৃন্দাবাস'।

কারও মতে, গোলাপটির বাড়িতে নজরুল সাড়ম্বরে কালীপূজো করেছিলেন। এতে স্থানীয় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাই হেমন্ত-কুমার সরকারের পরামর্শে আকবরউদ্দীন সাহেব কাজীকে গ্রেস কটেজ বাড়িতে নিয়ে যান।

এ বক্তব্য খুব জোরালো বলে মনে হয় না। কারণ নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরের মুসলমান সমাজের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন না.। তাঁদের কথাতেও তিনি কৃষ্ণনগরে আসেন নি।

এক হতে পারে যে তিনি কালীপুজো করায় হিন্দুরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তেমন কোনও গুঞ্জন শোনা যায় না। অনিলদা (চক্রবর্তী) আমাকে এই কালীপুজোর কথা শুনিয়েছিলেন। তিনি সে পুজোর প্রসাদ খেয়েছিলেন বলেও জানিয়েছিলেন। তিনি কারও ক্ষোভের কথা জানাননি। তবু, হয়তো কেউ কেউ ক্ষুব্ধ হয়েও থাকতে পারেন। তাতে পাড়া ছাড়তে হয়েছিল কবিকে—এমন পরিস্থিতি হলে তা প্রচারিত হতোই, এবং নজরুলভক্ত যুব সমাজ সে ক্ষেত্রে নীরব দর্শক থাকত, এটাও মনে হয় না। এ সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষ্ণনগরের হিন্দু সমাজ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সমাজ তখন রক্ষণশীল যথেষ্টই ছিল। নেদিয়ার পাড়া ছিল অন্যতম রক্ষণশীল ব্রাহ্মণপল্লী। সেখানে একটি সাহিত্য আসর ছিল। যাঁকে কেন্দ্র করে এবং যাঁর বাড়িতে এই আসর বসত তিনি ছিলেন একজন হিন্দু বালবিধবা—সরোজবাসিনী গুপ্তা। তিনি কলকাতার 'উপাসনা' পত্রিকার লেখিকা ছিলেন। উপাসনা পত্রিকার সম্পাদক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সে-কারণে কৃষ্ণনগরে এসে শ্রীমতী গুপ্তের সাহিত্য বাসরে যোগ দিতেন। বাইরে থেকে আরও অনেকে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন নিরুপমা দেবী এবং অনুরূপা দেবী। কৃষ্ণনগরের বিপ্লবী যুবকরাও অনেকে সে আসরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামও কৃষ্ণনগরে এসে সে আসরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এই আসরে যাতায়াত করতেই রক্ষণশীল পল্লীতে বিরূপ মন্তব্য ও গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। যাকে বলে ঘোঁট। এই সরোজবাসিনী গুপ্তা ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবী শিবরাম গুপ্তর মাসীমা। শিবরাম বাবু এই ঘোঁট সম্পর্কে আমাকে লিখিতভাবে একটি বিবরণ দিয়েছিলেন: 'নজরুলের একটি সাহিত্য আসর বসত নেদিয়ার পাড়ার পি. এল. চ্যাটার্জী লেনে সরোজবাসিনী গুপ্তার বাড়িতে। সরোজ-

বাসিনী ছিলেন একজন হিন্দু বালবিধবা—তাঁকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আসর যে গড়ে উঠতে পারে এ চিন্তা বর্তমানে করা যত সহজ তৎকালে তা অতো সহজ তো ছিলই না বরং সামাজিক অপরাধ বলে মনে করা হতো, বিশেষতঃ সেই আসরে যখন একজন মুসলমান কবির আগমন ঘটতো। এরই প্রতিক্রিয়া যে ঘটেনি তা নয়। যার ফলে রক্ষণশীল সমাজপতি ও বিদ্রোহী কবির বিদ্রোহী অনুগামীদের মধ্যে একটি বড় রকমের সংঘাতের সম্ভাবনা এক ছোটখাটো ঘটনায় সমাপ্তি লাভ করে।'

ছোটখাটো এই ঘটনাটির বিবরণ আমি শ্রী গুপ্তর মুখ থেকে শুনেছি। সমাজপতিরা সরোজবাসিনীর নামে কুৎসামুখর হয়ে উঠলেন। যুবতী বিধবা সরোজবাসিনী ক্ষোভে দুঃখে কৃষ্ণনগর ত্যাগ করে কাশীবাসিনী হতে মনস্থ করলেন। কিন্তু কাশী যেতে টাকা দরকার। সে টাকা তাঁর ছিল না। তাই তাঁর স্নেহভাজন প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তকে সব কথা জানিয়ে বললেন, মঘা, তুই আমাকে কুড়ি পঁচিশটা টাকা দে। আমি কাশী চলে যাই।

পরদিন সকালবেলা তথাকথিত সমাজপতিদের একজন সরোজ-বাসিনীর বাড়ির সামনে পথের কলতলায় জল নিতে এলে প্রমোদরঞ্জন তাঁকে কচার ডাল দিয়ে বেধড়ক পিটিয়েছিলেন। এ নিয়ে সমাজে উত্তাপ সৃষ্টি হলেও বিপ্লবী যুবকদের ঘাঁটাতে সাহস করেননি কেউ। কুৎসা গুঞ্জনও থেমে গিয়েছিল। সরোজবাসিনী গুপ্তাকে কাশীবাসী হতে হয়নি।

এই বিবরণ থেকেই অনুমান করা যায় যে কালীপূজো করার জন্য কোন হিন্দু ক্ষুব্ধ হলেও নজরুল ইসলামের বাসা বদল করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি সেদিন।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে, কাজী নজরুল ইসলামের এই বাসা বদল প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা জানিয়েছেন :

'যখন নজরুলের দিকে কেউ বড় ফিরে তাকায় না, তখন কৃষ্ণনগরের স্নেহশীল অধ্যাপক শ্রী হেম দত্তগুপ্ত কবিকে তাঁর বাড়ির কাছে নিয়ে আসেন। সে বাড়িটার নাম ছিল গ্রেস কটেজ।'[৪০]

এটা আরেক প্রশ্ন—আরেক সমস্যার কথা।

'গ্রেস কটেজ' বাড়িটা গুপ্তনিবাসের সামনে বটে। কিন্তু অধ্যাপক গুপ্ত কবিকে গ্রেস কটেজে নিয়ে এসেছিলেন এমন গুঞ্জন শহরে শোনা যায় না। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন কবির ঘনিষ্ঠ জন। তিনি কবির কাছে গোলাপটির বাড়িতে যেমন এসেছেন, গ্রেস কটেজেও তেমন এসেছেন। কবির কাছ থেকেই একথা শুনেছেন মনে হয়। কবির এই বাসা বদলের পিছনে যাঁদের সাহায্য সহযোগিতা ছিল, তাঁদের ভিতর অধ্যাপক গুপ্তও হয়তো একজন ছিলেন। হয়তো তাঁর সুপারিশ মতোই এই সুন্দর বাড়িটা ভাড়া পেয়েছিলেন কবি।

এখানে প্রশ্নটা অন্য। বাসা বদলের কারণটা—যা লেখক জানিয়েছেন। সম্মেলন ইত্যাদি মিটে গেল। তারপরই কবিকে আর বড় কেউ দেখেনা কেন? প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এর আগে লিখেছেন : 'হেমন্তবাবুর বাড়িতে নজরুলের অভাবের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়।'[৪১]

হঠাৎ কি ঘটল যাতে কবি এমন দুর্দশার মধ্যে পড়লেন? হেমন্তকুমার সরকার কবিকে কৃষ্ণনগরে এনেছিলেন, এবং কবির সব দায়দায়িত্ব বহন করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে একথা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

'হেমন্তবাবু তাই নজরুলকে বলেছিলেন—তোমার লেখার ভাবনা, সংসারের ভাবনা ভাবতে হবে না, সে ভাবনা আমার। হেমন্তবাবু শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বেশ কয়েক বৎসর তাঁর কথা রেখেছিলেন, ঠিক অভিভাবকের মন নিয়ে। দীর্ঘদিন হেমন্তবাবু বিদ্রোহী কবিকে আপন একান্নবর্তী পরিবারের মতই দেখেছিলেন। নজরুলের বন্ধুদের মধ্যে হেমন্তবাবু ছাড়া এমন করে নজরুলকে উপবাসের হাত থেকে আর কেউই বাঁচান নি।'[৪২]

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যগুলি মনে প্রশ্ন তোলে। প্রথমতঃ উক্তিগুলো স্ববিরোধী। হেমন্তবাবু যদি কয়েক বছর যাবৎ নজরুলকে উপবাসের হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন এবং একান্নবর্তী পরিবারের মতোই কবি পরিবারকে দেখে থাকেন তাহলে হেমন্তবাবুর বাড়ি থেকে

নজরুলের অভাবের সঙ্গে লড়াই শুরু হয় কি ভাবে? শ্রী চট্টোপাধ্যায় এক স্থানে জানিয়েছেন যে কবির বাড়ির ভাড়া হেমন্তবাবুরা দিতেন এবং কবি কবির সংসার খরচও বহন করতেন। তাহলে অভাব কেন? এবং হেমন্তবাবু অভিভাবকস্বরূপ থাকতে কেন অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্ত কবিকে গ্রেস কটেজে আনতে গেলেন? আবার তিনি কবিকে গোপনে সাহায্য করতেন। কেন? এমন প্রয়োজন দেখা দিল কি কারণে? কবি যে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন তা জানা যায় ব্রজকে লেখা তাঁর চিঠি থেকে। এই সব বিবরণ পড়ে মনে ধারণা জন্মায় যে কৃষ্ণনগরে ওই সম্মেলনগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত কবির সুবিধা অসুবিধা দেখা বা দেখভাল করার কোন ক্রটি ঘটেনি। কিন্তু সম্মেলনগুলো শেষ হওয়ার পরই কবিকে দেখার আর কেউ থাকল না। অর্থাৎ তাঁকে দেখভাল করার ব্যবস্থা উঠে গেল। কেন? লেখক এ বিষয়ে কোন কারণ দেখাননি—তার ইঙ্গিতও দেননি। ফলে বিভ্রান্তি জাগে। যিনি কৃষ্ণনগরে এলে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করা হলো—তাঁর প্রতি এমন অবহেলা প্রদর্শনের কি এমন কারণ ঘটেছিল?

এই অবহেলা বা কবির দিক থেকে পিছন ফেরার ইঙ্গিত এস. এম. আকবরউদ্দীনও তাঁর নিবন্ধে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে গ্রেস কটেজ বাড়িতে নজরুলের কাছে শহরের তেমন কেউ আসতেন না।

'এমনকি পুরুষদের মধ্যেও খুব কমসংখ্যক লোক আসতেন। হেমন্ত সরকার, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (পরে দেশ পত্রিকার সম্পাদক) তাঁর ভাই মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জনকতক আসতেন। জমজমাট গানের আসর কখনো হয়নি বললেও অত্যুক্তি হয় না।'[৪৩] কিন্তু প্রশ্ন একটাই—কেন এমন হলো?

কেউ কারণ উল্লেখ করেননি। সামান্য ইঙ্গিতও নেই। ফলে আজ এ প্রশ্নের মীমাংসা মেলা ভার।

তবু সেকালের কৃষ্ণনগরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে বোধহয় এই প্রশ্নের একটা সন্তোষজনক উত্তর মেলে। সম্মেলন চুকে গেল। কাজী তখনও গোলাপপটির বাসায়। সেটা সে মাস। সেই

সময় এক অঘটন ঘটে গেল। কাজী যখন কৃষ্ণনগরে আসেন তখন বিপ্লবী অনন্তহরি মিত্র আলিপুর জেলখানায় বিচারাধীন রাজনৈতিক বন্দী। সেখানে ২৮শে মে জেলখানার মধ্যে পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট ভূপেন চাটুজ্জে খুন হলেন বন্দীদের হাতে। খুনী হিসাবে যাঁদের সন্দেহ করা হলো তাঁদের ভিতর অনন্তহরি মিত্র একজন। অনন্তহরি ছিলেন কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার গুপ্ত বিপ্লবী দলের নেতা। কৃষ্ণনগরেই ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্র। এই দলের সদস্যরাই তো ছিলেন নজরুলের সহায়ক এবং অন্তরঙ্গ। যেমন প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত। ইনি ছিলেন দলের অন্যতম প্রধান সক্রিয় কর্মী। স্বভাবতই এঁরা বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অনন্তহরির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। অনন্তহরি খুনের আসামী হওয়ায় তারকদাস ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে। মামলার তদ্বির-তদারক করতে ছোটাছুটি শুরু করলেন। সেপ্টেম্বর মাসে অনন্ত-হরি মিত্র-র ফাঁসি হয়ে গেল। তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রমোদ-রঞ্জন সেনগুপ্ত কারারুদ্ধ হলেন। এই ডামাডোলের মধ্যে যুবকরা আর নজরুলের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেননি আগের মতো। আমার বড় মামার কথায়—তারকদা-ই নেই। আমি আর কার নির্দেশে কাজ করবো?

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত বিবরণের তাৎপর্য বোধহয় এটাই। নজরুল ইসলাম কবে গোলাপটির বাসা ছেড়ে গ্রেস কটেজে এসেছিলেন? আমার অনুমান তিনি গ্রেস কটেজে এসেছিলেন সেপ্টেম্বর মাসে, তারকদাস ও প্রমোদরঞ্জন কারারুদ্ধ হলে। নজরুলের সংসারে অভাব অনটনের শুরুও বোধহয় এই সময় থেকে। অক্টোবরে তাঁর ছেলে বুলবুলের জন্ম হয়। এই সময় থেকেই তাঁর অভাব অনটনের কথা জানা যাচ্ছে। মনে হয়, তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কারারুদ্ধ হলে তাঁর কয়লার দোকানও বন্ধ হয়েছিল। ফলে নজরুলের সংসারে যেখান থেকে আর্থিক সাহায্য আসত সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই নজরুল বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। যে বাড়িতে দরিদ্র ভাণ্ডার কার্যালয় ছিল, যে বাড়িতে তারকদাস থাকতেন, সে বাড়ির মালিক ছিলেন পাঁচু বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর ছেলে প্রাবৃট (রামু) বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন যে তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়লার দোকানের হিসাবের খাতাপত্র তাঁদের বাড়িতে অনেককাল রক্ষিত ছিল। তাতে তিনি দেখেছিলেন—কাজী নজরুলের নামে খয়রাতি খাতায় একটি পাতা ছিল। তাতে দেখা গিয়েছে যে কাজীর বাড়িতে সারা মাসের কয়লা এবং চাল সরবরাহ করা হতো বিনামূল্যে। প্রাবৃট বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানিয়েছেন যে, তারকদাস যখন কারারুদ্ধ হন, সেই সময়েই পাঁচুবাবুর পিতা অর্থাৎ প্রাবৃটবাবুর পিতামহ পরলোকগমন করেন এবং পাঁচুবাবু নাবালক তবু তারকদাস কারাগার থেকে সেই নাবালক পাঁচুবাবুকেই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন—কাজীর মাসোহারার টাকা যেন পৌঁছে দেওয়া হয়। নাহলে কাজী অসুবিধায় পড়বেন। প্রাবৃট বন্দ্যোপাধ্যায় একথা তাঁর বাবার কাছ থেকে শুনেছেন বলে জানিয়েছেন।

এই সব তথ্যের আলোয় অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শুধু হেমন্তকুমার সরকার নন, আরও কাদের সক্রিয় সাহায্য সহযোগিতার ওপর কৃষ্ণনগরে নজরুল জীবন নির্ভরশীল ছিল এবং সহসা কেন হেমন্ত সরকারের বাড়িতে থাকাকালীন নজরুলের সংসারের অভাব অনটনের শুরু হয় আর কেনই বা কবির দিকে বড় কেউ আর তাকায় না।

কবিকে গ্রেস কটেজ বাড়িতে কে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন—সেকথা বলা মুস্কিল। এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত। তথ্যগত প্রমাণের অভাব। সর্বজন স্বীকৃত কোন মত নেই। তবে আমার বড় মামার একটা কথা মনে খটকা লাগায়। তিনি বলতেন, কাজী ওই পাড়ায় উঠে গেলেন আমরা আর কি দেখব? অর্থাৎ গ্রেস কটেজ বাড়িতে উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা রহস্যময়।

নয়

কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে বাস করেছিলেন (১৯২৬-২৮) তিন বছর। তাঁর এই কৃষ্ণনগর জীবন ছুটি পর্বে বিভক্ত। একটি গোলাপটি পর্ব, অন্যটি চাঁদ সড়ক পর্ব। কৃষ্ণনগরে এসে প্রথমে ছিলেন

গোলাপপটিতে। সেখানে ছিলেন সম্ভবত ছ' মাস থেকে আট মাস। বাকী প্রায় আড়াই বছর ছিলেন চাঁদ সড়ক পল্লীর গ্রেস কটেজ বাড়িতে। দুটি পর্বে ভাগ করার কারণ কবির জীবনধারা ও সৃষ্টিধারার ভিন্নতা।

গোলাপপটি পর্ব কবির ব্যস্ততার কাল। কৃষ্ণনগর তখন নানা সম্মেলন নিয়ে ব্যস্ত। কবি এসে যুক্ত হয়ে গেলেন সে সবের সঙ্গে। নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজ বর্তাল তাঁর ওপর। সে দায়িত্ব পালন করতে তাঁর স্নানাহারের সময় ঠিক থাকল না। ক'মাস ধরে কায়িক শ্রম করে সুযোগ্য কর্মীর ভূমিকা যেমন পালন করলেন, কবির ভূমিকাও তেমনি পালন করলেন যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গীত রচনা করে। তিনি তাঁর ভূমিকা যথাসাধ্যই পালন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন, প্রত্যাশা, তাঁর আদর্শবাদী মন আহত হয়েছিল ভীষণভাবে, সম্মেলনগুলোর পরিণতি দর্শনে। বঙ্গীয় প্রজাসম্মেলনের পরিণতিতে কংগ্রেসের কব্জা থেকে বেরিয়ে এসে পেজেন্টস এ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি নামে স্বতন্ত্র একটি সংস্থা জন্ম নিল। এটা আনন্দদায়ক হলো বটে। কিন্তু ছাত্র সম্মেলনে গণ্ডগোল হলো। প্রধান অতিথি বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে আক্রমণ করল যুবকরা। নজরুল এবং সরলাদেবী চৌধুরাণী প্রধান অতিথিকে টাউন হলের বাইরে নিয়ে এসে রক্ষা করলেন। সম্মেলনের এই দুঃখজনক পরিণতি কী প্রতিক্রিয়া এনেছিল কবির মনে? অতো পরিশ্রম করে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চাওয়ার পরিণতি কি হলো? এর চেয়েও বড় ধরনের ব্যর্থতা এলো প্রাদেশিক জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে। সম্মেলনগুলোর ভিতর এটাইতো ছিল প্রধান। কারণ সমগ্র জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ এবং ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ নির্ভর করছিল এই সম্মেলনের ওপর অনেকখানিই। বঙ্গ-দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন এক অরাজক দশা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর শুরু হয়েছে নেতৃত্বের লড়াই। ফলে দলাদলি, কলহ বিবাদ, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত, দাঙ্গা। অনৈক্যের চোরাবালিতে জাতি বিপন্ন, অসহায়। এই পরিস্থিতির মধ্যে

প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসছে কৃষ্ণনগরে। জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নির্ধারিত হবে এখানে। পরিস্থিতি বুঝেই কাজী নজরুল ইসলাম উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে রচনা করলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গান। সেই মুহূর্তে তিনি যেন সমগ্র জাতির বিবেকস্বরূপ হয়ে গেলেন। জাতি বিপন্ন—হে নেতৃবৃন্দ সাবধান। জাতিকে নিরাপত্তা দেবার দায় তোমাদের। তাই লিখলেন :

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম' ঐ জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

এই আকুল আবেদন জানিয়েছিলেন সেদিন কবি বাঙলার নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে। এই আবেদনকে সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত সদস্যদের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে কবি অতি দরদ দিয়ে গানটি গেয়েছিলেন। কিন্তু কি ফল হয়েছিল তার? 'নজরুল ইসলাম এত করে তার 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সম্মেলনে গাইল বটে, কিন্তু তার আবেদন সকলের হৃদয়ে পৌঁছল না।'[১৪৪] শেষ অবধি সভা পণ্ড হয়ে গেল। শ্রোতার দল প্রাণ ভয়ে পলাতক। সভাস্থলে ছাতা জুতো আর গান্ধীটুপির স্তূপ। কৃষ্ণনগরের গোলাপটি পর্বে নজরুল ইসলামের এই হচ্ছে কার্যকলাপ ও তার পরিণতি।

সৈনিক হাবিলদার জীবন থেকে কাজী নজরুল ইসলামের যে সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়েছিল, কলকাতায় এ.স তা পরিণত হয়েছিল বিদ্রোহী কবির ভূমিকায়। সেই ভূমিকার পরিণতি ঘটল যেন কৃষ্ণনগরে গোলাপটি পর্বে, ওই সম্মেলনের ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে। 'ভাঙার গান'-এর কবি যেন থমকে গেলেন বা থেমে গেলেন এখানেই। কবি নজরুল ইসলামের জীবনের একটি ধারার বা পর্বের সমাপ্তি ঘটল এই গোলাপটি পর্বে।

আশাহত মর্মাহত কবি গোলাপটির বাসা ছেড়ে চলে এলেন চাঁদ সড়কে গ্রেস কটেজ বাড়িতে। এখানেই তিনি প্রায় আড়াই বছর

বাস করেছিলেন এবং এখানে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের রূপ, সুর ও মেজাজ একেবারে ভিন্ন রকম। তাঁর সেই সৃষ্টির কথা ভেবেই বলা যায় যে তাঁর জীবনে বিদ্রোহী পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে গোলাপটি পর্বে। কবি নজরুল ইসলামের জীবনেহিতাসের ক্ষেত্রে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রেস কটেজ বাড়িতে এসে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ভিতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'দারিদ্র্য' কবিতা, গজল গান এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। এই সৃষ্টির ভিতর চীৎকার, হৈচৈ, উচ্চ নিনাদ—কিছুই নেই। আছে মরমী কবির পরিচয়। কবি এখানে একাকী যেন জীবনের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন। কবির জীবনের আশ্চর্য এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। বহির্মুখীনতা ছেড়ে কবি এখানে অন্তর্মুখীন। এখানে সম্মেলন নেই, হৈচৈ নেই, ব্যস্ততা নেই, সর্বদা যুবসমাজ ঘিরে নেই। এখানে কাছে বাগানবাড়ির শান্ত নির্জনতা, খোলামেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পারিবারিক জীবন : আর আছে চাঁদ সড়ক পাড়া—তার মানুষজন—দীন দরিদ্র দুঃখী মানুষের সমাজ। উপন্যাসে তিনি এই পাড়ার পরিচয় দিতে লিখেছেন, '···একটেরে চাঁদ সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মতো করে গাছপালার আড়ালে টেনে রাখা।'

অর্থাৎ এ পাড়া শহরের একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল।

ভাবতে গেলে মনে হয় কবি বুঝি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদে গোলাপটি ছেড়ে চলে এসেছিলেন গ্রেস কটেজ বাড়িতে। তিনি কি তবে পালিয়ে এসেছিলেন ?

এস. এম. আকবরউদ্দীন লিখেছেন :

'চাঁদ সড়কের বাড়িতে আসার কিছু দিন পর থেকে নজরুলের মনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে পথে পথে মানুষ নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ধূমকেতুর মতই আবির্ভূত হয়েছিলেন কলকাতার সাহিত্যিক মহলে। তার পরের ক'টা বছর কেটেছে একটা প্রকাণ্ড হৈচৈ-এর মধ্যে। তার প্রথম পরিচয় হল 'বিদ্রোহী' কবি হিসাবে। দেশের তৎকালীন পরিবেশও ছিল বিদ্রোহী। এই পরিবেশ সুন্দরের পিয়াসী কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছিল। সেটা তিনি বুঝতেনও।

কৃষ্ণনগরে আসার পর চাঁদ সড়কের বাড়িতে নীরবে নিস্তব্ধতার মধ্যে তিনি নিজের সত্তা খুঁজেছিলেন। এখানে আসবার পর কলকাতায় এমনকি হুগলীতেও যা সম্ভব হয়নি তাই হয়েছিল। নিশীথ রাতের তারার মালা দেখবার পরিপূর্ণ সুযোগ তাঁর হয়েছিল।'[৪৫]

আকবরউদ্দীন সাহেবের বক্তব্যের সমর্থন আছে কাজী নজরুলেরই একটি চিঠিতে। কবি চিঠিটা লিখেছিলেন বন্ধু মোতাহার হোসেনকে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে।

'আমাকে সবচাইতে অবাক করে নিশীথ রাতের তারা, ছেলেবেলা থেকে তার শব্দহীন উদয়াস্ত···।'

এই বক্তব্যেরই জের টেনে আকবরউদ্দীন লিখেছেন,

'এই সব দেখতে দেখতে ও ভাবতে ভাবতে চলার পথে মাঝে যে ছেদ পড়েছিল, চাঁদ সড়কের এই বাড়িটায় আসার পর যে 'শব্দহীন উদয়াস্ত' পরিপূর্ণ রূপে দেখার ও ভাববার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন বিদ্রোহী তখন হার মানতে শুরু করেছে। ১৯২৯ সাল থেকে লেখা কবিতা ও গানগুলো পড়লে ও পূর্বতন কবিতা ও গানের সঙ্গে তুলনা করলে এর স্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যায়।···চাঁদ সড়কের নির্জনতায় নজরুলের মধ্যে একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব এসে গিয়েছিল।'[৪৬]

আকবরউদ্দীন স্মরণ করেছেন : 'আলাপ আলোচনায় বুঝতে পারতাম মাঝে মাঝে যেন তিনি মনের অতল সমুদ্রে ডুব দিতে চাচ্ছেন, চেষ্টা করছেন, বিদ্রোহী যেন কিছু শান্ত হয়ে আসছেন ; পৃথিবীর কোলাহলের ঊর্ধ্বে যে সঙ্গীতের সুর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হচ্ছে সেই সুর তরঙ্গে ডুব দেওয়ার একটা আকুলতা তাঁর অন্তরে জাগ্রত হচ্ছে।'[৪৭]

এই বিবরণ যেন বলতে চাচ্ছে যে গ্রেস কটেজ বাড়ির পরিবেশই কবিমানসের রূপান্তর ঘটিয়েছে।

ঠিক তা নয়। বস্তুত কবিমানসই এমন একটি পরিবেশ প্রত্যাশী হয়ে উঠেছিল সে সময়। কলকাতার সাহিত্য জগতে ধূমকেতুরূপে নজরুলের যে জীবন শুরু হয়েছিল, কৃষ্ণনগরের গোলাপটিতে এসে সে পর্বের সমাপ্তি ঘটেছে। কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগরের গোলাপটির

জীবন পর্যন্ত কবি আত্মস্থ হবার সুযোগ পাননি। হৈচৈ তুলে 'ধূমকেতু' জীবন ছুটেছে হৈ-হট্টগোলের মধ্যেই। কৃষ্ণনগরের সম্মেলনগুলো বিশেষত ঐতিহাসিক প্রাদেশিক সম্মেলন ঘটিয়ে দিয়েছে তাঁর সেই ধূমকেতু জীবনের পরিসমাপ্তি। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের বারুদে জল ঢেলে দিয়েছে। অন্যদিকে তিনি সংসারী হবার পর হুগলীতে প্রথম সন্তান কৃষ্ণমহম্মদের অকাল মৃত্যু ঘটেছে, সংসারে অভাব অনটন শুরু হয়েছে, তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, কাতর—এই অবস্থায় কৃষ্ণনগরে চলে এসেছেন বিপন্ন দশা থেকে মুক্তির আশায়। এখানে এসে পেয়েছেন আদর আপ্যায়ন সাহায্য সহযোগিতা। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন সে সব থেকে বঞ্চিত হয়ে আবার সেই বিপন্ন দশা। এই সময়েই তিনি গ্রেস কটেজ বাড়ির পরিবেশকে পেয়ে আত্মস্থ হবার সুযোগ পেয়েছেন এবং আত্মমুখীন হয়ে উঠেছেন। তবু চাঁদ সড়কে এসেও কবি রাজনীতির পথে আরেকবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

'১৯২৬ সালে এই বাড়ীতে আসার পরে নজরুল ইসলাম আরও একটি কাজ করে বসল। সে প্রার্থী হলো কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে। তার জীবনে অনেক অবিবেচনার কাজের মধ্যে এটাও ছিল একটি। সমস্ত ঢাকা বিভাগ (ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জিলাকে নিয়ে ছিল এই বিভাগ) হতে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্যে তুইটি আসন রক্ষিত ছিল। তাতে শুধু মুসলিমরা ভোট দেওয়ার অধিকারী।...এই জাতীয় সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের অর্থাৎ স্বরাজ পার্টির তেমন মন ছিল না। তবু তাঁরা তাঁদের তরফের নাম এই সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁরা কাঠাল ভাঙলেন নজরুল ইসলামের মাথায়।'[৪৮]

এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর্থিক সংগঠনও কাজীর ছিল না। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে সাড়ে তিনশ টাকা দিয়েছিলেন নির্বাচনে লড়তে। এই নির্বাচনে তাঁর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এই পরাজয় ব্যর্থতা আরও বিশেষভাবে তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল তাঁর নবজন্মের পথে। তিনি আত্মমুখীন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই বিপর্যস্ত

মানসিকতা থেকে উত্তরণের পথে আনুকূল্য দিয়েছিল গ্রেস কটেজ বাড়ির উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নির্জনতা। এই সব কারণেই কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে কৃষ্ণনগর-বাস গুরুত্বপূর্ণ।

দশ

গ্রেস কটেজ বাড়িতে বসে কবি রচনা করলেন 'দারিদ্র্য' কবিতা। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের জন্ম হলো এই বাড়িতে। কবির সংসার ভরে উঠল শিশুর কান্না হাসিতে। কবি গ্রেস কটেজ বাড়ির আমতলায় বসে শুরু করলেন গজল গান রচনা করতে। প্রেমের গান, ভালোবাসার গান, ফুল, পাখির গান। কবি যেন অসি ছেড়ে বাঁশি ধরলেন। হয়ে উঠলেন মরমিয়া।

এরপর একসময় লিখতে শুরু করলেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। তা প্রকাশিত হতে থাকল ধারাবাহিকভাবে মাসিক সওগাত-এ ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে। উপন্যাসে লেখা হতে থাকল চাঁদ সড়ক পল্লীর বিশদ বাস্তব তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ। লেখা হতে থাকল সেকালের চাঁদ সড়ক পল্লীর নরনারী—তাদের আচারআচরণ, কথাবার্তা, মুখের ভাষা—ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র। নজরুল সাহিত্যে স্থায়ী আসন পেলো চাঁদ সড়ক তথা কৃষ্ণনগর।

মুজফফর আহ্মদ লিখেছেন, 'এই জায়গাটা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক ইলাকা।'[৪৯]

কেন বিখ্যাত—তার কোন কারণ দেখাননি লেখক।

সুশীলকুমার গুপ্তও লিখেছেন, 'নজরুল একসময় কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক এলাকায় বাস করতেন।'[৫০]

আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন: 'গ্রন্থের প্রথম দিকে কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কের চাঁদ-বাজারস্থিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর ওমান কাতলি (রোমান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট ক্রীশ্চানের সুখ দুঃখের একটি জীবন-ঘনিষ্ঠ বর্ণনা পাওয়া যায়।'[৫১] শ্রীগুপ্ত সম্ভবতঃ মুজফফর আহ্মদ-এর গ্রন্থের ওই উল্লেখকেই অনুসরণ

করেছেন, তাই চাঁদ সড়ক কেন বিখ্যাত তার ব্যাখ্যা নেই। আর চাঁদ সড়কের 'চাঁদ বাজারস্থিত' শব্দটি বিভ্রান্তিকর। কারণ চাঁদ সড়ক পল্লীতে চাঁদ বাজার কেন—কোন বাজারই ছিল না সেসময়, আজও নেই। চাঁদ বাজার লেখার কারণ মনে হচ্ছে, 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে নজরুলের লেখা একটি বাক্য। চাঁদ সড়কের বাসিন্দাদের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'এরাই থাকে চাঁদ সড়কের চাঁদ বাজার আলো করে।'[৫২]

স্পষ্টতই চাঁদ বাজার হচ্ছে বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ—যাকে ব্যাঙ্গার্থে বলা হয়—'চাঁদের হাঁট'। সেই চাঁদের হাটই এখানে হয়েছে চাঁদ বাজার।

চাঁদ বাজার ছিল না চাঁদ সড়কে। তেমনি তার খ্যাতির কারণও জানা যায় না।

'চাঁদ সড়ক' নামটি রাজার আমলের। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব-পুরুষ রাজা রাঘব রায় তাঁর রাজধানী মাটিয়ারী (বানপুর মাজদিয়ার পাশে) থেকে উঠিয়ে আনেন কৃষ্ণনগরে। তখন কৃষ্ণনগর ছিল না। ছিল অরণ্য শোভিত অখ্যাত একটি ক্ষুদ্র পল্লী—নাম রেউই। রাজা রাঘব রায়ের পুত্র রাজা রুদ্র রায় রেউই নাম-এর পরিবর্তে জায়গাটার নতুন নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। এই কৃষ্ণনগর হয় নদীয়ারাজের রাজধানী। রাজা রুদ্র রায়ই রাজবাড়ি স্থাপন করেন এবং শহর পরিকল্পনা করেন। রাজবাড়িকে কেন্দ্র করে শহর পরিকল্পিত হয়েছিল। অর্থাৎ মাঝখানে পরিখাবেষ্টিত প্রাসাদ, তার চারদিকে নগর। এই নগর চার অংশে বিভক্ত। চারদিকে চার অংশ, প্রতি অংশ বা অঞ্চল এক একটি নাম-করণের দ্বারা চিহ্নিত। রাজবাড়ির দক্ষিণ অংশ বৈকুণ্ঠ সড়ক, পূর্ব অংশ নতুন সড়ক। উত্তর অংশ গোবিন্দ সড়ক আর পশ্চিম অংশ চাঁদ সড়ক। এই অঞ্চলের ভিতর বহু পাড়ার অবস্থান। রাজবাড়ির পশ্চিম দিকে চাঁদ সড়ক একটি মৌজার নাম। এই মৌজার চতুঃসীমা হচ্ছে : রাজবাড়ির পশ্চিমে বর্তমান রেললাইন অবধি। পুবে বেজিখাল, দক্ষিণে রায়পাড়া এবং উত্তরে জলঙ্গী নদীতীর। এই বিস্তৃত অঞ্চল

অনেক পল্লীতে বিভক্ত। তার ভিতর যেমন রায়পাড়া আছে, তেমনি সেকালের সাহেব পল্লীও আছে, আবার চাঁদ সড়ক নামে একটি পল্লীও আছে। পূর্বকালে রায়পাড়াকেই চাঁদ সড়ক বলা হতো। রায়পাড়ায় রাজার আত্মীয়রা বসতি করেছিলেন। এটা ছিল বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পল্লী। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের যৌবনকালে রামতনু লাহিড়ীর বন্ধু মাধবচন্দ্র মল্লিক কৃষ্ণনগরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলে তিনি রায়-পাড়ায় বাসা করেছিলেন। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতে স্থানটিকে উল্লেখ করেছেন চাঁদ সড়ক বলে। আর এখন যে-চাঁদ সড়ক পল্লী সেখানে তখন কোন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর বাসযোগ্য গৃহ বা পরিবেশ কিছুই ছিল না, নজরুলের কালেও ছিল না। কৃষ্ণনগরে রেলস্টেশন হওয়ার ফলে, স্টেশন থেকে গোয়াড়ী আসার জন্য চাঁদ সড়ক মৌজার বুক চিরে রাস্তা তৈরী হওয়ায় মৌজাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। ফলে রায়পাড়া চাঁদ সড়ক নাম ছেড়েছে। ক্রমে অন্য পাড়াগুলোও স্বনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান চাঁদ সড়ক পল্লীটিই চাঁদ সড়ক নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বর্তমান চাঁদ সড়ক পল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত যুগী পাড়া, বৈষ্ণব পাড়া, বহুবাজার প্রভৃতি পল্লী এবং ওই পল্লীগুলিই তখন বিশেষভাবে পরিচিত বা বিশিষ্ট ছিল। এই সব ছোট ছোট পল্লীগুলোর চারপাশে ছিল বড় বড় ফল বাগান আর সেগুন বন। এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে যাওয়ার পথের দুপাশে ছিল সেই সব বাগান আর সেগুন বন।

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মশায়রা থাকতেন এখনকার রোমান ক্যাথলিক পল্লীর মেরী ইমাকুলেট হাসপাতালের উত্তর সংলগ্ন 'রাণী কুঠি' বাড়িতে। সেখান থেকে তিনি যাতায়াত করতেন চৌধুরী পাড়ায়। দক্ষিণ পুবে। সে পথ আজ নেই। তাঁর আত্মকথায় উল্লেখ আছে সে পথের। সে পথের দুপাশে ছিল সেগুন বন। পথ নির্জন। জ্যোৎস্না রাতে বাড়ি ফেরার পথে সেগুন গাছে তিনি শাকচুন্নী দেখেছিলেন—এমনই মজার পথ ছিল। বর্তমান চাঁদ সড়ক পল্লী তখন কেমন ছিল বলা মুস্কিল। তবে খুবই নগণ্য ছিল। বিখ্যাত ছিল না। তবে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে উল্লেখিত মোংলা পুকুর নামে পুকুরটি যে অতি প্রাচীন একথা বলা হয়ে

থাকে। এককালে মনে হয় খুব বড়সড় পুকুর ছিল এটা। এখনও বেশ বড় এবং জলও অনেক। জনশ্রুতি এই যে যুগী পাড়ার মানুষেরা এই পুকুর ধারে তাঁদের ধর্মাচরণ করতেন। ওঁরা নাথ যোগী সম্প্রদায়-ভুক্ত। রাজার রাজধানী স্থাপিত হবার পর শহর গড়ে উঠেছে। রাজার কর্মচারী, আত্মীয়রা এসে বসতি গড়েছেন। এসেছেন ব্যবসায়ী সমাজ। এইভাবে নানা স্তরের মানুষের সমাবেশ ঘটেছে শহরে। কিন্তু এই যোগী সম্প্রদায় এভাবে এসেছিলেন কি? সম্ভবত তাঁরা আরও প্রাচীন বাসিন্দা—সেই রেউই গ্রামের নবদ্বীপের নিকটবর্তী স্থান। নবদ্বীপকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চল সমূহে একদা নানা ধর্মমতের মানুষের অবস্থান ছিল। বৌদ্ধ জৈন তো ছিলই। নাথ যোগীদেরও অবস্থিতি সম্ভব। কৃষ্ণনগর হবার আগে রেউই গ্রাম ছিল গোপ পল্লী প্রধান। কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে গোপপল্লীর স্বীকৃতি আছে। এমনই কি বলা হয় যে, এই গোপ সম্প্রদায় কৃষ্ণভক্ত ছিল। তারা নানাভাবে কৃষ্ণপূজো করতো। রাস করতো, ঝুলন করতো, জন্মাষ্টমী পালন করতো সাড়ম্বরে। তাই রাজা রুদ্র রায় রেউই-এর নামকরণ করেছিলেন কৃষ্ণনগর। অনুমিত হয় গোপপল্লীর পাশেই নাথ যোগী সম্প্রদায়ের বাস ছিল রেউই গ্রামে। কিন্তু তাদের উল্লেখ নেই। কারণ বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ রাজার কাছে নাথ যোগী সম্প্রদায় ব্রাত্য। লক্ষণীয় এই যে নাথ যোগী পল্লীর পাশেই বৈষ্ণব পাড়ার অবস্থান। কারণ বর্ণাশ্রম বিরোধী এই সম্প্রদায়ও ব্রাত্য এবং অনুমিত হয় এই যুগীপাড়া বৈষ্ণব পাড়া তখন শহরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে একটেরে। যোগী সম্প্রদায়-এর ধর্মাচরণের স্থান ছিল সেগুন বন ঘেরা মোংলা পুকুরের ধারে। মোংলা পুকুর নামটা সেই মঙ্গলাচরণের স্থান বা পুকুরের থেকে এসেছে। মঙ্গলা থেকে মোংলা। মঙ্গল পুকুর থেকে মোংলা পুকুর। অবশ্য এটা ইতিহাস নয়, জনশ্রুতি। এই নামকরণ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীও আছে। সেটি একটু কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। তাই উল্লেখ করা হলো না। কিন্তু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী মিলিয়ে পুকুরটির প্রাচীনতার কথা ভাবা যায়। পুকুরটি বর্তমান চাঁদ সড়ক পল্লী স্থাপিত হবার আগেই ছিল বলে মনে হয়।

অঞ্চলটা যত প্রাচীন এই চাঁদ সড়ক পল্লী তত প্রাচীন নয় বলেই ধারণা।

নজরুলের কালে এই চাঁদ সড়ক পল্লীতে বাস করতেন শ্রমজীবী দরিদ্র মুসলমান এবং কিছু রোমান ক্যাথলিক দেশী খৃষ্টান। উভয় গোষ্ঠিই শ্রমজীবী এবং দরিদ্র। এঁদের অবস্থানের কথায় গোয়াড়ীর জনবসতির কথা ওঠে। কৃষ্ণনগর শহর প্রধানত দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। একটি কৃষ্ণনগর অন্যটি গোয়াড়ী। রাজা যে শহর স্থাপন করেছিলেন সেটা কৃষ্ণনগর। সেটা শহরের দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের নাম গোয়াড়ী। রাজার শহরের উত্তর দিকের শেষ সীমান্ত আমিন রাজার নেদিয়ার পাড়ার পর থেকে উত্তরে নদীতীর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল গোয়াড়ি। এটায় তখন শহর গড়ে ওঠেনি। এখানে কিছু ছোট ছোট পল্লী ছিল। যেমন চাষাপাড়া (সদগোপপল্লী) কাঠুরে পাড়া, ধোপা পাড়া, ছুতোর পাড়া, কুমোর পাড়া, মালোপাড়া ইত্যাদি। বাকী অংশ ছিল পতিত ভূমি। গোচারণ ক্ষেত্র। গো বাড়ি। তা থেকে নাম হয়েছে গোয়াড়ী। ইংরাজ শাসন শুরু হলে নদীয়া জেলার সদর শহর হিসাবে নির্বাচিত হলো কৃষ্ণনগর। তখন সরকারী দপ্তর সমূহ স্থাপিত হতে থাকল পতিত ভূমি গোয়াড়ীতে। ফলে এই অঞ্চলটা ইংরাজের শহর হিসাবে গড়ে উঠল। এই শহর গড়ার সময় গোয়াড়ীও আবার দুভাগে বিভক্ত হলো। নদীতীর পর্যন্ত পশ্চিম দিকটা সাহেবরা দখল করে গড়ে তুলল সাহেব পাড়া। আর পূর্বদিকে আশ্রয় নিল দেশি মানুষরা। উকীল মোক্তার আমলা অন্যান্য কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং নানা বৃত্তির মানুষ। এ বিষয়ে দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' গ্রন্থে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। সাহেব পাড়ায় শুধু জজ ম্যাজিস্ট্রেটরাই বাসিন্দা হলেন না। নীলকর সাহেবরা নদীর ধারে বড় বড় বাড়ি করে বাস করতে থাকলেন, সে সব বাড়ি এখনও আছে। যেমন জেলা শিক্ষাদপ্তরের বাড়ি, জজ সাহেবের বাড়ি, রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের পুরনো অংশ, জেলা শাসকের বাড়ি, কুইন স্কুল বাড়ি, জেলাপারষদ বাড়ি। পুবে পাত্রবাজার অঞ্চল পর্যন্ত ছিল সাহেব পাড়ার সীমানা। পাত্রবাজারে কুঠিবাড়ি নামে গোলাকার যে জীর্ণ

বাড়িটা আছে, ওটা নাকি মিস মরিয়র নাম্নী এক মহিলার বিলাতি হোটেল বাড়ি ছিল। ওর পাশে সি. এম. এস. স্কুল বাড়িটাও ছিল আদিতে নীলকরের বাড়ি। আবার এখনকার রোমান ক্যাথলিক পাড়ায় ডনবস্কো স্কুল যেখানে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল সে বাড়িটাও ছিল নীলকরের বাড়ি। আর কোম্পানীর বাগানে ছিল পোলো খেলার মাঠ, তার পাশে কৃষিকার্যের মাঠে হতো ঘোড়দৌড়। তাই ওই জমির নাম সরকারী দলিলে আর. সি. মাঠ। অর্থাৎ রেসকোর্স মাঠ। এ ভাবেই ইংরাজ সাহেবরা সেদিন গোয়াড়ীর সাহেবপাড়া গড়ে তুলেছিল। আর তাদের বাড়িঘর তৈরী করতে, তাদের আর্দালী চাপরাশি বাবুর্চি খানসামা ইত্যাদি কাজের জন্য নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের মুসলমান রাজমিস্ত্রী, ছুতোর এবং সেবক সমাজ কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস শুরু করেছিল, এবং তা করেছিল এই চাঁদ সড়ক পল্লীতে। এখানে বাস করার দুটো কারণ। একটি কারণ এই স্থান সাহেব পাড়ার সংলগ্ন। দ্বিতীয় কারণ মনে হয় এটা তখন পতিত দশায় ছিল। ব্রাত্য পল্লী যুগী পাড়া ও বৈষ্ণব পাড়ার পাশেই এর অবস্থান। কিন্তু কোন সময়ে এই পল্লী গড়ে উঠেছিল? অর্থাৎ চাঁদ সড়ক শ্রমজীবী পল্লীর বয়স কতো হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে ইংরাজরা কবে থেকে এখানে বসবাস শুরু করেছিল সেটা জানতে পারলে।

একটা তথ্য মিলছে।

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় আসেন ব্রিটিশ ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি হয়ে। এদেশে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখতে আগ্রহী হলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীতে গেলেন, ১৭৮৪-৮৫ সালের শীতকালে। কিন্তু সেখানকার কোনও ব্রাহ্মণই এই বিদেশিকে দেবভাষা শেখাতে রাজী হলেন না। ১৭৮৫ সালের শরৎকালে জোন্স দম্পতি নদীপথে কৃষ্ণনগরে এলেন। তিনি সংস্কৃত শিখতে আসছেন শুনে সব ব্রাহ্মণ শহর ছেড়ে দূর গ্রামে পালিয়ে গেলেন। 'কিন্তু জোন্স সন্ধান পেলেন রামলোচন নামে একজন ব্রাহ্মণের

যিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং জোন্সকে শেখাতে রাজী হলেন। জোন্স কৃষ্ণনগরে একটি বাংলো কিনে ফেললেন এবং পরবর্তী ছয় বৎসর প্রতি গ্রীষ্মকালে কোর্টের ছুটির সময় স্বামী-স্ত্রী কৃষ্ণনগরে কাটাতেন সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। জোন্স যখন পড়া লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতেন তখন আনা মারিয়ার সময় কাটত চিত্রাঙ্কনে। কলকাতা এবং কৃষ্ণনগরে ইংরেজ এবং ইঙ্গবঙ্গ সমাজ উভয়ের দৃষ্টিতেই জোন্স দম্পতি ছিলেন এক আধা-পাগলা দম্পতি যারা সাধারণ লোকের মতো অবসর সময় অতিবাহিত করেন না।'[৫৩]

স্যার উইলিয়ম জোন্স কৃষ্ণনগরে এলেন ১৭৮৫ সালের শরৎকালে এবং একটি বাংলো কিনে ফিললেন। বাংলো অর্থে ইংরেজদের বাড়ি। এবং নিশ্চয়ই তেমন বাড়ি সেখানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকতে পারেন। সেই ১৭৮৫ সালে কৃষ্ণনগরের সাহেব-পাড়ায় তাহলে কেনবার মতো অমন বাংলো ছিল এবং নিশ্চয়ই ওই একটি মাত্রই বাংলো ছিল না। এই প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, শহরে ইংরেজ এবং ইঙ্গবঙ্গীয়দের একটি সমাজও ছিল যাঁরা জোন্স দম্পতিকে আধাপাগলা বলতেন। অর্থাৎ এই সময়ের আগেই কৃষ্ণনগরে সাহেব পাড়া জমে উঠেছিল। ১৭৫৭ সালে হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধ। তার আটাশ বছরের মধ্যে কৃষ্ণনগরের এই রূপ। কারও কারও মতে পলাশীর যুদ্ধের আগে থেকেই কৃষ্ণনগরে ইংরাজরা বসতি করতে শুরু করেছিল। স্যার উইলিয়াম জোন্স যে-বাংলোটা কিনেছিলেন তা সত্যিই সুন্দর ছিল। সেটা আজও আছে। সেই বাড়িতেই এখন জেলা শিক্ষা দপ্তর। এই সব বাংলো তৈরী করতে রক্ষণাবেক্ষণ করতে কতো রাজমিস্ত্রি, ছুতোরমিস্ত্রি এবং অদক্ষ শ্রমিকই কর্মরত ছিল। আর সাহেবদের খানসামা আর্দালি, বাবুর্চিও কতো ছিল। তারাই চাঁদ সড়ক পল্লী গড়ে তুলেছিল। এই চাঁদ সড়ক পল্লীর বয়স তাহলে কম নয়। পলাশীর যুদ্ধের সমসাময়িক কাল ধরা যায়। চাঁদ সড়ক পল্লীর প্রাচীন বাসিন্দা এরা বংশানুক্রমে এখানেই বাস করেছে এবং পূর্ব-পুরুষের বৃত্তিকেই ধরে থেকেছে। এই সাহেব পাড়া ক্রমে দুটি ভাগে

বিভক্ত হয়েছে। একটি প্রটেষ্টাণ্ট পল্লী অন্যটি রোমান ক্যাথলিক পল্লী। ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সি. এম. এস. বা সেণ্ট জন স্কুল। সেই সঙ্গে স্থাপিত হয় প্রটেষ্টাণ্ট গীর্জা। ক্রমে সেই স্কুল এবং গীর্জাকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে গড়ে ওঠে প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান পল্লী। ধর্মান্তরিত দেশী খৃষ্টানদের পাড়া। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে চাঁদ সড়কের মানুষের মুখে ওটা 'ছিটেন' পাড়া। অর্থাৎ খৃষ্টান শব্দটি মুখে মুখে হয়ে দাঁড়িয়েছে—ছিটেন।

এরপরে আরেকটি গীর্জা গড়ে উঠেছে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের। তাদের গীর্জা চাঁদ সড়কের মুসলমান পল্লীর কোল ঘেঁষে পশ্চিম দিকে। সেই গীর্জাকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছে রোমান ক্যাথলিক পল্লী। তারাও ধর্মান্তরিত দেশী খৃষ্টান। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে চাঁদ সড়ক পল্লীর মানুষের মুখে ওরা 'ওমান কাতলি'।

কাজী নজরুল ইসলাম এই চাঁদ সড়ক পল্লী ও তার বাসিন্দাদের নিয়েই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনা করেছেন। এই পাড়ার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন : 'তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান আর ওমান কাতলি (রোমান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট ক্রীশ্চানে মিলে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায় ···মাথার ওপরে টেরির মত এদের মাঝে দু'চার জন ভদ্দরনুকও আছেন ···কিন্তু এতে তাদের সৌষ্ঠব বাড়লেও গৌরব বাড়েনি।'[৫৪]

নজরুলের কালে চাঁদ সড়কে এই ভদ্দরনুক পরিবারের ভিতর একটি ছিল এস. এম. আকবরউদ্দীন সাহেবদের পরিবার। এঁদের আদি নিবাস ছিল জাঙ্গীর (জাহাঙ্গীর) পুর গ্রামে। কৃষ্ণনগরের সন্নিকটে।

এগার

কৃষ্ণনগর শহরে চাঁদ সড়কের অবস্থান কেমন ছিল সে কথা জানাতে গিয়ে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে লেখক জানিয়েছেন, 'এক টেরে চাঁদ সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত করে গাছপালার আড়ালে টেনে রাখা।'

কবি নজরুল ইসলাম বিবরণটিকে কাব্যময় করেছেন। পড়লে যেমন বেদনা জাগে চাঁদ সড়কের প্রতি সহানুভূতি জাগে, তেমনি কৃষ্ণনগরের শহরের প্রতি কিছুটা বিরূপতা জাগে চাঁদ সড়কের প্রতি তাদের বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য। কেন এমন ভাবে তাদের অবহেলা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে ? কিন্তু এমন পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে বাস্তব কারণেই, চাঁদ সড়ক পল্লীর জন্ম লগ্ন থেকেই। তলিয়ে দেখলে এটাই মনে হয়। সেকালে এই পল্লীকে ঘিরে ছিল একাধিক ফলবাগান, বাঁশ ঝাড়, ডোবা ইত্যাদি। ফলে এটা ছিল শহর সীমার বাইরে, বিচ্ছিন্ন অবস্থায়।

কৃষ্ণনগর ও গোয়াড়িতে আরও অনেক মুসলমান পল্লী ছিল। ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত বাঙালি অবাঙালি—নানা স্তরের মানুষের বসবাস ছিল সেখানে। রাজমিস্ত্রি. ছুতোর মিস্ত্রি, ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান, সহিস. ব্যবসায়ী, সরকারী কর্মী, শিক্ষক, আইনজীবী, উচ্চপদাধিকারী, মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান, জেলাকোর্টের চেয়ারম্যান, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষা মন্ত্রী, লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশনার—সবই ছিল। এই মুসলমান সমাজ ছিল গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের জনজীবনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু চাঁদ সড়ক তো তা ছিল না। প্রথম থেকেই এই পল্লীর মানুষ ছিল সাহেব সমাজের সেবক। তাদের জীবিকা ও জীবন ছিল সাহেব সমাজের সঙ্গে যুক্ত। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে লেখকও সেই রকম কথাই জানিয়েছেন। এই পাড়ার খৃষ্টান ও মুসলমান বাসিন্দাদের সম্পর্কে লেখা হয়েছে :

'একই প্রভুর পোষা বেড়াল ও কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে, এরাও যেন তেমনি। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে গোমরায় যথেষ্ট, অথচ বেশ মোটা রকমের ঝগড়া করবার মত উৎসাহ বা অবসর নেই বেচারীদের জীবনে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদের পুরুষরা জন-মজুর খাটে—অর্থাৎ রাজমিস্ত্রী, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐ রকমের কিছু একটা করে।'[৫৫]

এরই ফলে এরা শহর জীবন থেকে মূলত বিচ্ছিন্ন এবং সম্পর্কহীন

ছিল। তাদের জীবন নিয়ে শহরবাসীদেরও মাথা ব্যথা ছিল না তেমন। শহরের আর কোনও মুসলমান পল্লী সম্পর্কে একথা লেখা সম্ভব ছিল না। এই পল্লী সম্পর্কেই লেখা সম্ভব হয়েছে—'একটেরে চাঁদ সড়ক।' এই কারণেই চাঁদ সড়ক পল্লী ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নজরুলের দৃষ্টিতে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল বলেই তিনি তাঁর উপন্যাসের পটভূমি করেছেন এই পল্লীকে। এবং এই পল্লীর বাস্তব নিখুঁত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

'প্যাঁকালে স্নান করতে চলল ক্রিশ্চান পাড়ার ভিতর দিয়ে। মোংলা পুকুরটাই তার কাছে হয়, কিন্তু কেন যে সে অতোটা ঘুরে গোল পুকুরে নাইতে যায়, তা আর লুকো ছাপা নেই, ও পুকুরে নাইতে যারা যায় তাদের কাছে। প্রেমের পথ সোজা নয় বলেই হয়ত সোজা পথে যায় না সে।'[৫৬] মোংলা পুকুর আর গোল পুকুর। চাঁদ সড়কে মোংলা পুকুরের মতন গোল পুকুরও আছে। চাঁদ সড়ক পল্লী থেকে সেটা একটু দুরেই। বর্তমানে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার সামনে—উত্তর দিকে, পথের ধারেই। অর্থাৎ গোল পুকুর লেখকের কল্পিত নয়। উপন্যাসে যে পরিবার কেন্দ্রিক কাহিনী, সেই পরিবারের একমাত্র জীবিত পুরুষ প্যাঁকালে যুবক। সে কুশি নামে একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছে। কুশিরা আগে মুসলমান ছিল। এখন খৃষ্টান। এই কুশিকে দেখবার জন্য প্যাঁকালে মোংলা পুকুরে স্নান করতে না গিয়ে খৃষ্টান পাড়া ঘুরে গোল পুকুরে স্নান করতে যায়। লেখক প্যাঁকালের প্রণয় কথা জানাতে গিয়ে পল্লীর দুটি পুকুর ও তার অবস্থানকে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন।

ওই পরিবারের সেজ বউ আর তার নবজাতক পুত্র মৃত্যুশয্যায় তখন। দারিদ্র্যের কারণে না পেয়েছে ওষুধ না পেয়েছে পথ্য। শেষে রোমান ক্যাথলিক ইউরোপীয় পাদরী সাহেব একটি বিদেশিনী নার্সকে সঙ্গে এনে চিকিৎসা শুরু করলেন। কিন্তু তখন শেষ অবস্থা। বাঁচান গেল না ওদের কাউকেই। প্রথমে সেজ বউ গেল। তারপর গেল তার ছেলে। ভোরবেলা সেজ বউয়ের ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শোকের বাড়ি।

দুপুরে বাড়ির বিধবা মেজ বউ শোকার্ত হৃদয়ে বাড়িতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। এই প্রসঙ্গে লেখক সেই বাড়ির পারিপার্শ্বিকের একটা বিবরণ দিয়েছেন।

'গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ, যেন কোন সর্বগ্রাসী রাক্ষসের প্রত্যপ্ত আঁখি। বাঁশ গাছগুলো যেন তন্দ্রাবেশে ঢুলে ঢুলে পড়েছে। ডোবার ধারে গাছের ছায়ায় পাতি হাঁসগুলো ডানায় মুখ গুঁজে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ঝিমচ্ছে। একপাল মুরগি আজ কাঁঠালের ঝোপে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে।'[৫৭]

এ বিবরণও লেখকের মনগড়া নয়। নজরুলের আমল কেন, তা পরেও দেশ বিভাগ পর্যন্ত চাঁদ সড়ক পল্লীর ওই রকম পরিবেশই ছিল। ডোবা, বাঁশ ঝাড়, ঝোপ ঝাড় আর আম কাঠালের বাগান পরিবৃত। এই বিবরণের পরবর্তী অংশে আরও স্পষ্ট নির্দিষ্ট চিত্র মেলে।

'অদূরে বাবুদের বাড়ীর সখের বিলিতি তালগাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে। তারই সামনে দীর্ঘ দেবদারু গাছ—যেন ইমামের পেছনে অনেকগুলো লোক সারি সারি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছে—সামনের শুকনো বাগানটায় জানাজার নামাজ।'[৫৮]

অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্তর কথা আগে বলা হয়েছে। কারও মতে ওই অধ্যাপকই নজরুলকে নিজের বাড়ির কাছে গ্রেস কটেজে এনেছিলেন। লেখক এই বিবরণে অধ্যাপক গুপ্তের বাড়ির প্রবেশ পথের সম্মুখ ভাগের বর্ণনা দিয়েছেন। গ্রেস কটেজের পুবে পথের অপর পারে এই বাড়ি। বাড়িটি এখনও আছে, কিন্তু তার প্রবেশ পথের সে রূপ আর নেই। সেই দেবদারু আর মিলিত তালের সারির পরিবর্তে এখন সেখানে দোকানপাট বাড়িঘরের সারি। নজরুলের কালে বাড়ির সাবেক রূপই ছিল। তখন এই বাড়ির পুব সীমা ছিল বেজি খালের পাশের পথ পর্যন্ত আম দক্ষিণে বিস্তৃত ছিল নতুন পল্লী পর্যন্ত। নতুন পল্লী এবং সেখানকার পুকুর—সবই ছিল বাড়ির সীমানাভুক্ত। এই বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে ছিল 'গুপ্ত নিবাস'। অধ্যাপক হেম দত্তগুপ্তর পিতা অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তর বাড়ি। ফলবাগান আর সেগুন বনের

আড়ালে থাকত সে বাড়ি। তার প্রবেশ পথ ছিল গ্রেস কটেজ বাড়ির সামনে অর্থাৎ চাঁদ সড়ক পল্লীতে প্রবেশ পথের প্রায় মুখোমুখি। মস্ত ফটক। তার ভিতর সুরকি ফেলা পথ। সেই পথের একপাশে ছিল বিলিতি তালগাছের সারি। আরেক পাশে দেবদারুর সারি। সেই পথ দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেলে তবে গুপ্তদের বাড়ি। এখনো সে-ভাবেই অনেকটা গেলে বাড়ি মেলে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন 'নিকটেই ছিল 'দত্তনিবাস' বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্তের বাড়ি।'[৫৯]

এই তথ্যে একটু ত্রুটি ঘটেছে। বাড়িটার নাম দত্তনিবাস ছিল না, গুপ্তনিবাস ছিল। প্রবেশ পথের ডান দিকে পিতলের ফলকে ইংরাজীতে লেখা ছিল 'গুপ্তনিবাস'। বাঁদিকের থামে পাথরের ফলকে লেখা ছিল অধ্যাপক উমেশচন্দ্র গুপ্তের জন্ম মৃত্যুর তারিখ ও তাঁর পরিচয় এবং কীর্তি কথা। এখন দুটি ফলকই খুলে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো রক্ষিত আছে উমেশচন্দ্রের পৌত্র নৃসিংহপ্রসাদ গুপ্তের (তিলুদা) কাছে। কৃষ্ণনগরের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাসে উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত স্মরণীয় পুরুষ। তাঁর বাড়িটিও তেমনি শহরের ইতিহাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। উমেশচন্দ্রের স্মৃতিচারণা (বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থ) থেকে জানা যায় যে ওই বাড়িতে রামতনু লাহিড়ী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সেকালের মনীষীদের যাতায়াত ছিল, অনেক বিশিষ্ট সায়েব-সুবোও যেতেন। বাড়িটির সেই রূপ সেই সৌন্দর্য এখন আর নেই। নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসেই সে-চিত্র অক্ষয় হয়ে আছে। সেই বাবুদের বাড়ি। সেই বিলিতি তাল আর দেবদারুর সারি।

চাঁদ সড়কের দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের কাছে 'গুপ্তনিবাস' সেদিন ছিল 'বাবুদের বাড়ি'। তারা তাই বলত। নজরুলও তাঁর গ্রন্থে তাই লিখেছেন—'অদূরে বাবুদের বাড়ি'। লিখেছেন কারণ মেজ বউ দেখছে। মেজ বউদের কাছেইতো বাবুদের বাড়ি। এ থেকেই বোঝা যায় নজরুল তাঁর উপন্যাসে চাঁদ সড়কের বাস্তব চিত্র কীভাবে

তুলে ধরতে চেয়েছেন।

এই বিবরণের পরেই আরেকটা বিবরণ হচ্ছে : 'এমন সময় উত্তরের আমবাগানের ছায়া শীতল পথ দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা মিস জোন্স প্যাকালেদের ঘরে এসে হাজির হলো।'[৬০]

রোমান ক্যাথলিক গীর্জা থেকে চাঁদ সড়ক পল্লীতে আসবার তখন যে-পথ ছিল তার পাশে আম কাঠালের বাগানই ছিল। গ্রেস কটেজের পিছনে উত্তর পশ্চিমে বেজি খাল অবধি বিস্তৃত ছিল সে বাগান। এখন সেখানে পাড়া বসেছে, স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এই ভাবে দেখলে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে দেখা যায়, সেদিনের চাঁদ সড়কের চাঁদ সড়ক পল্লীর নানা বাস্তব চিত্র ছড়িয়ে আছে। শুধু চাঁদ সড়ক কেন, গোয়াড়ির আরও নানা স্থানের তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ মেলে।

'দিন কয়েক আগে থেকে তার শাশুড়ীও কাঠুরে পাড়ার সাবডেপুটি সায়েবের বাড়িতে চাকরী নিয়েছিল।'[৬১]

শাশুড়ী অর্থে প্যাকালের মা। উপন্যাসের কাহিনীতে পরিবারের কর্ত্রী। চাঁদ সড়ক পল্লীর বাসিন্দা। সে পরিচারিকার বা পাচিকার কাজ পেয়েছে কাঠুরে পাড়ায় সাবডেপুটি সাহেবের বাড়িতে। চাঁদ সড়ক পল্লী থেকে কাঠুরে পাড়ার দূরত্ব অনেকখানি। শহরের পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ সড়ক, পূর্ব প্রান্তে কাঠুরে পাড়া। প্রায় মাইল খানেক ব্যবধান। এর ভিতরে শহরে আরও অনেক পল্লী আছে। তা থাকতে কাঠুরে পাড়ায় চাকরী নিতে গেল কেন? কারণ এই যে, তখন কাঠুরে পাড়ায় অনেক মুসলমানের বাস ছিল। তাঁরা ছিলেন শিক্ষিত অভিজাত ধনী। তাই মুসলমান সাবডেপুটি সাহেব সেখানে বাসা নিয়েছিলেন। আর তাই প্যাকালের মার সেখানে কাজ জুটেছিল। এই ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে শহরের আরেক মুসলমান পল্লীর কথা। সেটা কুর্চিপোঁতা। এটা চাঁদ সড়কের কাছে, শহরের ভিতরে। এখানে এখনও মুসলমান বসতি আছে, মসজিদ আছে। তবে এই পল্লীর বাসিন্দারা ছিল দরিদ্র, অশিক্ষিতপ্রায়। এরা কেউ ছিল ঘোড়ার গাড়ীর চালক, কেউ কসাই, সামান্য কিছু শিক্ষিত পরিবারও ছিল। এখানেই বাপের বাড়ি

ছিল কাহিনীর বিশিষ্ট চরিত্র মেজ বউ-এর। তারাও ছিল দরিদ্র। সেজ বউ-এর মৃত্যু হলো ভোরবেলা। মৃত্যুর আগে রাতের বেলা মেজ বউ তার শিয়রে বসে তাকে ঘুমোতে বলছিল। তার উত্তরে সেজ বউ বলল, 'ঘুমোব বলেই তো কথা কয়ে নিচ্ছি। এমন ঘুমোব যে, ছুই গোদা ডাঙায় গিয়ে রেখে আসবে তিন গাড়ী মাটি চাপা দিয়ে, যেন ভূত হয়েও আর ফিরে আসতে না পারি।'[৬২]

গোদাডাঙা কৃষ্ণনগরবাসীর কাছে পরিচিত নাম। এটা রাধানগরের পাশে মাজদিয়া-শিবনিবাস যাবার পথের ধারে। এখানে মুসলমানদের একটি বড় গোরস্থান আছে। প্রধানত রাধানগর ঘূর্ণী, নাজিরা পাড়া প্রভৃতি মুসলমান পল্লীর মানুষেরাই এখানে তাঁদের শব সমাহিত করতেন। পাকাপোক্ত সমাধি-ফলকসহ দেখা যেত কিছুকাল আগেও। এছাড়া গোদাডাঙার আরেক পরিচয় হচ্ছে এটা কলকাতার ধাপার মতো কৃষ্ণনগরের ধাপা। পুরসভার যাবতীয় জঞ্জাল, মৃত পশু এমনকি বেওয়ারিশ লাশ এখানে পুঁতে রাখা হয়। সেটা গোরস্থান থেকে খানিক দূরে, ভিতরের দিকে। নাম গোদাডাঙাই। তাই শহরে গোদাডাঙার খ্যাতি। কিন্তু চাঁদ সড়ক থেকে এর দূরত্ব অনেক। শহরের বিশিষ্ট আইনজীবী এস. এম. বদরুদ্দিন সাহেব আমাকে জানিয়েছেন, চাঁদ সড়কের মানুষের গোরস্থান ছিল না গোদাডাঙা। তাঁদের গোরস্থান ছিল চাঁদ সড়কের পশ্চিমে ছোট রেল লাইনের (নবদ্বীপ লাইন) ওপারে। তাঁর মাকেও সেখানেই কবর দেওয়া হয়েছিল। তাহলে নজরুল ইসলাম সেজ বউ-এর মুখ দিয়ে গোদাডাঙার নাম শোনালেন কেন? মনে হয় তিনি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে এই দরিদ্র অসহায় নারীর মৃতদেহ উপযুক্ত মর্যাদায় সমাধিস্থ হবে না। বেওয়ারিশ শবের মতোই মাটি চাপা দিয়ে রাখা হবে। সেজ বউ-এর উক্তিতে সেই ইঙ্গিতই প্রকাশ পেয়েছে যেন। পরিবেশটাও সেই রকমই। এ ছাড়া সহসা গোদাডাঙার উল্লেখের অর্থ মেলে না। এর দ্বারা লেখক কৃষ্ণনগরের গোদাডাঙার পরিচয়টাই তুলে ধরেছেন। কৃষ্ণনগরবাসীও অবজ্ঞা, অবহেলা বা অসহায়তার কথা বলতেই গোদাডাঙার উল্লেখ করে

থাকেন। নজরুলও তাই করেছেন।

গঙ্গালের মার ছোট ছেলে প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার দলে নাচে। সখী সাজে, গান করে। 'প্যাঁকালে নেদের পাড়ার বাবুদের বৈঠকখানা হতে একটু চায়ের প্রসাদ পেয়ে এসে কাউকে কিছু না বলেই কন্নিক নিয়ে কাজে বেরিয়ে যাবার জোগাড় করছিল।'[৬৩]

নেদের পাড়া এ্যামেচার থিয়েটার ক্লাব নামে সেকালে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। এই থিয়েটার ক্লাব অভিনীত বিল্বমঙ্গল নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এস. এম. আকবরউদ্দীন। সেটা ছিল ১৯২৫ সাল। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের প্যাঁকালে টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখী সাজে, গান করে। অর্থাৎ নেদের পাড়ার থিয়েটার দলের সঙ্গেই সে যুক্ত। সেই সুবাদে নেদের পাড়ার বাবুদের সঙ্গে তার ওঠা-বসা। ভাব-ভালোবাসা। তাই সকালে উঠেই তাদের কাছে চা পান করতে যায়। এভাবেই কবি সেকালের চাঁদ সড়কের বাস্তব চিত্র আঁকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল তাই।

এস. এম. আকবরউদ্দীন ছিলেন চাঁদ সড়কে নজরুল ইসলামের নিকট প্রতিবেশী। কবির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। তিনি রোজই কবির বাসায় যেতেন। তিনি 'চাঁদ সড়কে নজরুল' শিরোনামে স্মৃতিকথা-মূলক একটি নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। সেটা প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার নজরুল এ্যাকাডেমীর পত্রিকার ১৩৭৬ সনের শীত ও বসন্ত সংখ্যায়। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা বা স্মৃতিচারণা করেছেন। তার মোদ্দা কথা হচ্ছে : গ্রেস কটেজ বাড়ির প্রবেশ পথের সামনেই একটি বারোয়ারী কলতলা ছিল (এখন সেটা নেই)। সেই কলতলায় পাড়ার মুসলমান এবং খৃষ্টান মহিলারা জল নিতে আসত এবং এই জল নেওয়া নিয়ে তারা প্রায় প্রতিদিনই ঝগড়া বাধাত। তুলকালাম ঝগড়া বাধত দুই সম্প্রদায়ের মেয়েদের মধ্যে, খিস্তি খেউর চলত। কবি ছিলেন এর প্রত্যক্ষদর্শী। সেই কলতলার ঝগড়াই কবিকে উৎসাহিত করেছিল চাঁদ সড়ক পল্লীর এই বিচিত্র জীবনযাপন ধারাকে নিয়ে কিছু লিখতে। তিনি আকবরউদ্দীন সাহেবকে বলেছিলেন

এই পাড়াটাকে নিয়ে বেশ লেখা যায়।

আকবরউদ্দীন বলেছিলেন, লিখুন না।

এই স্মৃতিকথা থেকেই স্পষ্ট হয় যে কবি সচেতনভাবেই চাঁদ সড়ক পল্লীর বাস্তব চিত্র বা পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আর এই কারণেই উপন্যাসটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলতলার ঝগড়ার কথা কেন গুরুত্ব পেলো সে বিষয়েও আকবরউদ্দীন সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কোন এক গ্রাম্য মৌলবী নজরুল ইসলামকে চিঠি দিয়েছিলেন কুৎসিত ভাবে গালমন্দ করে। নজরুল চিঠিটা দেখিয়ে ব্যথিত চিত্তে আকবরউদ্দীনকে বলেছিলেন, আমাকে যা খুশি বলুক, আমার স্ত্রীকে তার মধ্যে জড়ানো কেন? নজরুলকে সান্ত্বনা দিতে আকবরউদ্দীন কবির বাড়ির সামনের কলতলায় পাড়ায় মেয়েদের ঝগড়ার কথা তুলেছিলেন। সেখানে কতো কুৎসিত ভাষায় পরস্পরকে গালমন্দ করে। কতো অসার। মৌলবীর আক্রমণও ওই কলতলার ঝগড়ার মতন।

এই কথা থেকেই কলতলার ঝগড়ার কথা কবির চিন্তায় আসে। ঝগড়াটা বাধে রোমান ক্যাথলিক ও মুসলমান মহিলাদের মধ্যে। জাত নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, জলের কলসী ছোঁয়া নিয়ে। এসব কথা মনে হতেই কবির ইচ্ছা জাগে এই পল্লী ও তার জনসমাজ নিয়ে কিছু লিখতে। তারই পরিণতি এই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। অবশ্যই শুধু কলতলার ঝগড়া নয়, কবিকে দীর্ঘদিন ধরে এই পল্লীবাসীর জীবনধারাকে জানতে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে। তবে উপন্যাসের শুরুতেই তিনি কলতলার সেই ঝগড়ার দৃশ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ এই কলতলার ঝগড়া থেকেই তাঁর চিন্তামত কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে পল্লী মধ্যে।

'এই চাঁদ সড়কেরই একটা কলতলায় জল নেওয়া নিয়ে সেদিন মেয়েদের মধ্যে একটা ধুমঘাঙর ঝগড়া বেধে গেল। কে একজন ক্রীশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসী ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়ত একদিন এক জাতিই ছিল—কেউ হয়েছে মুসলমান কেউ ক্রীশ্চান। আর এককালে একজাত ছিল বলেই

এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে।'[৬৪]

এই বক্তব্যই উপন্যাসের মূল সুর।

এর পরই আছে ঝগড়ার বিবরণ। যে-ক্রীশ্চান মেয়েটি যে-মুসলমান মেয়েটির কলসী ছুঁয়ে দিয়েছে তারা দুজনেই কমবয়সী এবং তারা পরস্পরের বন্ধু। ফলে তারা ঝগড়া বাধায়নি। ঝগড়া বাধাল প্রবীণারা। তার বিবরণ হচ্ছে : 'গজালের মার পাড়াকে কুঁদুলী বলে বেশ নামডাক আছে। সে-ই অপোজিশন লীড করছে মুসলমান তরফ থেকে। অপর পক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মার মত ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর এবং স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না—একেবারে সেকালের ভীমকান্তা হিড়িম্বা দেবীর মতই। গজালের মা গজালের মতই সরু—হাড্ডিচামড়া সার, কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতই নির্মম হয়ে।'[৬৫] এই গজালের মা এবং তার পরিবারকে কেন্দ্র করেই কাহিনী গড়ে উঠেছে। গজালের মার সংসারে বড়, মেজ, সেজ,—তিনটি বিধবা বৌ, তাদের শিশু সন্তান-সমূহ আর ছোট ছেলে প্যাঁকালে বর্তমান। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্যাঁকালে। সে যুবক। পেশায় রাজমিস্ত্রী। কাহিনীর সূচনাকালে সে অবিবাহিত। প্রণয়ে লিপ্ত খৃষ্টান মধু ঘরামির মেয়ে কুর্শির সঙ্গে। সেজ বউ আর তার কোলের শিশু সন্তান রোগশয্যায় মরণাপন্ন। মেজ বউ যুবতী রূপসী, একটি ছেলে আর একটি মেয়ের মা। দরিদ্রের সংসার। খুবই গরীব। সংসার অচল প্রায়।

হিড়িম্বা খৃষ্টান মহিলা। সে ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শিনী। সেই কাজই সে করে। পাড়ার দাই হিসাবেই সে পরিচিত।

এস. এম. আকবরউদ্দীন জানিয়েছেন—এর অনেক কটি চরিত্রই বাস্তব। চাঁদ সড়কে তারা ছিল অন্য নামে। নজরুল ইসলাম শুধু নামগুলো পাল্টেছেন।

'গজালের মার আসল ডাকনাম হাবিব (হাবিবের) মা। তার তিন ছেলে—বড় নূর মহম্মদ, মেজ হাবিব, ছোট করিম—যাকে বইতে প্যাঁকালে নাম দেওয়া হয়েছে। সেজ বৌ হাবিবের স্ত্রী। বড় বৌ-র

কোন সন্তান ছিল না। এরা তিন ভাই সামান্য লেখাপড়া জানত। হাবিব ছিল পাঁড় মাতাল। জোয়ান বয়সে অকালে মারা যায়। দু তিন বছর পর দেওর করিমের সঙ্গে মেজ বৌর বিয়ে হয়েছিল।...ওমান কাতলি পাড়ার হিড়িম্বার সত্যিকার নাম ছিল কামিনী। দশাসই পুরুষালী চেহারা। ধাত্রী হিসাবে তার নামডাক ছিল। তাছাড়া ঝগড়া ও লোকের উপকার করা—উভয়তেই তার নামডাক ছিল।'[৬৬]

এস. এম. আকবরউদ্দীন সাহেব তাঁর ওই নিবন্ধে মেজ বউ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়েছেন। হাবিবের স্ত্রী মেজ বউ-এর নাম ছিল নাসরিন বিবি। সে ছিল ভরা যুবতী, আর রূপসী, মাথায় চুল ছিল গোছা ভরা, আর মুখে তার হাসি লেগেই থাকত। তার এই যৌবন, রূপ ও হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাব তাকে করেছিল অতি আকর্ষণীয়া। আর সেটাই হয়েছিল তার বিপদের কারণ। শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে সে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল। কিন্তু একদিন বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে এলো চাঁদ সড়কে। আকবরউদ্দীন সাহেবের বাড়িতে তার অবাধ গতি ছিল। সেখানে গিয়ে সে আকবরউদ্দীন সাহেবের স্ত্রীকে জানালে বাপের বাড়ি থেকে পালিয়ে আসার কারণ। সেখানে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। লোভী পুরুষরা উত্যক্ত করছিল। তাই সে পালিয়ে এসেছে। কারণ চাঁদ সড়ক পল্লী সুরক্ষিত, সেখানে কড়া শাসন আছে। বাইরে থেকে কেউ এসে তাকে উত্যক্ত করতে পারবে না। এর পরই সে জানাল, এক বাবু উত্যক্ত করছে, রাতের বেলা আসবে বলেছে, বেলতলায়। মেজ বউ-এর চালাঘরের সামনে পথের ধারে একটা বেল গাছ ছিল। আকবরউদ্দীন সাহেব বিষয়টা নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করলেন। কাজী শুনে প্রথমে বললেন, লোকটা এলে ধরে মার দিলেই হয়ে যাবে। আকবরউদ্দীন বললেন, না, সেটা বিশ্রী হবে। কাজী তখন বললেন, ঠিক আছে, ফন্দী বাৎলে দিচ্ছি। এরপর কাজী নজরুল ইসলামের ফন্দীমতো কাজ হলো। নিশুতি রাতে বাবু এসে দাঁড়ালেন বেলতলায়। অমনি গাছ থেকে একটি কাঁচা বেল পড়ল তার পাশে, তারপর আবার একটা, তারপর

আবার—বোধহয় গায়েও পড়ল। এবার বাবু ওরে বাপরে বলে পালাতে লাগল। আর ওঁত পেতে থাকা ছেলেরা তার পিছনে তাড়া করল হাঁড়োল-হাঁড়োল বলে চীৎকার করতে করতে। এরপর নাসরিন বিবি যাতায়াত শুরু করল গ্রেস কটেজ বাড়িতে নজরুল পত্নী প্রমীলা-দেবীর কাছে এবং নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হলো। আকবরউদ্দীন সাহেবের মতে নজরুলের কিছু দুর্বলতা জন্মেছিল নাসরিনের প্রতি। বাইরের বাবু ঠেকালেও পাড়ার অনেকেরই কুনজর ছিল মেয়েটির প্রতি। ফলে পাড়ার মোড়লরা দেওর করিমের সঙ্গে নাসরিনের বিয়ে দিয়ে দিল। নাসরিনের নিকে হচ্ছে শুনে নজরুল বলেছিলেন, কতোবড় ত্যাগ করল মেয়েটি। আকবরউদ্দীন বলেছিলেন, নাহলে আপনার সঙ্গে জড়িয়ে যদি কুৎসা রটত সেটা কতো বিশ্রী হতো।

আকবরউদ্দীনের বিবরণমতো মনে হয়, নজরুলকে রক্ষা করতেই নাসরিনের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নজরুল তখন বলেছিলেন, উপন্যাসে মেজ বউকে অমর করবেন।

এই কাহিনী জানার পর উপন্যাস পাঠ করলে বাস্তবতার রূপ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাস্তব চরিত্রগুলোকে নিয়ে তিনি বাস্তবসম্মত-ভাবেই খেলা করেছেন।

বাস্তবের কামিনী দাই কাহিনীতে হিড়িম্বা। ধর্মে খৃষ্টান, রোমান ক্যাথলিক। সে যেমন ঝগড়া করতে পারত তেমনি পরের উপকারও করতো। কাহিনীতেও তাই। গজালের মার মেয়ে পাঁচি শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এলো। সে তখন আসন্নপ্রসবা। চলে আসার কারণ,—তার স্বামী কেওড়াদের এক মেয়েকে মুসলমান করে নিয়ে বিয়ে করেছে। সেই অভিমানে স্বামী গৃহত্যাগ করেছে। কাহিনীতে যেদিন সকালে কলতলায় গজালের মার ঝগড়া হলো হিড়িম্বার সঙ্গে, সেই দিনই প্রসব বেদনা উঠল পাঁচির। রাতে প্রসব বেদনায় কাতর হয়ে পড়ল পাঁচি। কিন্তু দরিদ্র পরিবার, হাতে একটা পয়সা নেই যে কাঠুরে পাড়া থেকে টাকা খরচ করে দাই ডেকে আনবে। সকালবেলা গজালের মা ছোট ছেলে প্যাঁকালেকে বলল, 'ওরে পাঁচি যে আর বাঁচেনা।'

সে টেরি কাটতে কাটতে মুখ না তুলেই বলল, মরুক, আমি তার কি করব ? দাইয়ের টাকা দিতে পারবি ?...হঠাৎ পুত্র মুখ তুলে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, রোজ ঝগড়া করবি নুলোর মার সঙ্গে, নইলে সে-ই ত এতক্ষণ নিজে থেকে এসে সব করত।'[৬৭] এই নুলোর মা-ই হচ্ছে হিড়িম্বা।

অতঃপর গজালের মা বাড়ি থেকে বার হলো হিড়িম্বার খোঁজে। পথেই হিড়িম্বার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল গজালের মার। তাকে বিপদের কথা বলতেই হিড়িম্বা বলল। 'অ! তা তোর পাঁচির ছেলে হবে বুঝি ? আত (রাত) থেকে কষ্ট পাচ্ছে, আর আমায় খবর পাঠাসনি। আচ্ছা যা হোক মা তুই। আমার হলে ধন্না দিয়ে পড়তাম গিয়ে। চ দেখি।'[৬৮] হিড়িম্বা তখনই ছুটে গেল গজালের মার সঙ্গে এবং অতি সহজেই পাঁচির সন্তান প্রসব করিয়ে দিল। অবশ্যই বিনা পারিশ্রমিকে। আকবরউদ্দীন সাহেবের পুত্র এস. এম. বদরুদ্দিন, কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে তিনিও কামিনী দাই-এর হাতে জন্মেছেন। সে আজ সত্তর বছর আগের কথা। নজরুল যখন চাঁদ সড়কে আসেন তখন বদরুদ্দিন সাহেবের বয়স বছর চারেক। তাঁর জন্ম ১৯২২ সালে। সে সময় কামিনী দাই-ই ছিল ওই পাড়ার বিশিষ্ট ধাত্রী। নজরুলও তাকে ধাত্রী হিসাবেই রেখেছেন।

মেজ বউ বা নাসরিন বিবি কেমন ছিল বাস্তবে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। নজরুলের উপন্যাসেও সেই বিবরণ: 'মেজ বৌয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু। দুঃখের আগুনে পুড়েও ও সোনা এতটুকু মলিন হয়নি। বর্ষা ধোওয়া চাঁদনির মত আজও ঠিকরে পড়ছে। পাড়ার মেয়েরা বলে, মাগী রাঁঢ় হয়ে যেন ষাঁড় হচ্ছে দিনকে দিন। ওর সবচেয়ে বদ অভ্যাস কারণে অকারণে ও হাসে। অপরূপ সে হাসি, যেন ফুটে ওঠা ফুলে হঠাৎ চন্দ্রোদয়।'[৬৯]

আগেই জানা গিয়েছে, পাড়ায় নাসরিন বিবির দিকে লোভের বা লালসার দৃষ্টি ছিল অনেকের। উপন্যাসেও লেখক গজালের মার মুখ দিয়ে সেকথা বলিয়েছেন: 'হ্যাঁ লা বড় বৌ, সত্যি ছুঁড়ী নিকে

করবেনা ত ? ছুঁড়ীর যে রূপ ঠিকরে পড়ছে এখনো, তার ওপর পাড়ার মাগনেড়ে হতচ্ছাড়ারা দিন রাত আছে ছুঁড়ীর পানে হাপিত্যেশ করে তাকিয়ে। আ মলো যা। ড্যাকরারা যেন হুলো বেড়াল। ইচ্ছে করে দিই চোখে লগা ঠেসে।'[৭০] এই ভাবেই বাস্তব চরিত্রগুলোকে নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং কাহিনীর প্রয়োজনেই চরিত্রগুলোকে ভেঙে-চুরে নিজের মতো করে সাজিয়েছেন। যেমন মেজ বউ। বাস্তবে নাসরিন বিবির কোন সন্তান ছিল না। কাহিনীতে মেজ বউ-এর দুটি শিশু সন্তান। একটি ছেলে আরেকটি মেয়ে। বাস্তবে, পাড়ার লোক মিলে নাসরিন বিবির নিরাপত্তার প্রয়োজনে দেওর করিমের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কাহিনীতে নজরুল তা করেননি। কাহিনীতে দেখানো হয়েছে যে প্যাঁকালের সঙ্গে মেজবউ-এর বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সে প্রস্তাব উঠছে 'শাশুড়ীর' পক্ষ থেকেই। এমন প্রস্তাবের কারণ গজালের মার মনের ভয়—বউ অন্য কোথাও নিকে করে পর ঘরী হয়ে যাবে। ভয় জেগেছে মেজ বউ-এর প্রতি পাড়ার লোকের লোভ দেখে এবং মেজ বউ-এর রহস্যময় আচরণের কারণে। আরও এক কারণ, মেজ বউ-এর ভগ্নীপতি হঠাৎ ধনী ঘিয়াসুদ্দিনের মেজ বউ-এর দিকে নজর পড়ায়।

এসবই নাসরিন বিবির জীবনের বাস্তব সংকট কথারই প্রকাশ যেন। সেই পাড়ার লোকের লোলুপ দৃষ্টি কথা আর ভগ্নীপতি ঘিয়াসুদ্দিন যেন বাপের বাড়ির পাড়ার বাবু যে রাতের অন্ধকারে বেলতলায় এসেছিল। পাড়ার লোক মিলে বিয়ে দিয়েছিল নাসরিন বিবির। এখানে শাশুড়ী গজালের মা-ই যেন পাড়ার লোকেরই প্রতিনিধিস্বরূপ বা তাদের সম্মিলিত রূপ। 'সেদিন বড় বৌ, প্যাঁকালে, তার মা আর পাঁচিতে মিলে একটা গোপন পরামর্শ সভা বসেছিল। প্যাঁকালে অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে বললে, আমি তা কখনও পারব না।...তার মা অনুনয়ের স্বরে বললে, রাগ করিস কেন বাবা ? এমন ত সব গরীব ঘরেই হচ্ছে আমাদের। তা ছাড়া ওর চাঁদপানা মুখ যে কিছুতেই ভুলতে পারছিনে। অমন বউ পর হয়ে যাবে ?...পাঁচি মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল, তা ভাই

তোমার এক আশ্চয্যি লজ্জা? অমন ত কতই হচ্ছে। একদিন ভাবী বলেছো বলে বুঝি আর ইয়ে করতে নেই। দুদিন বাধবে, তার পর আপনি সরগর হয়ে যাবে, দেখে নিও।'[৭১]

নাসরিন বিবির সঙ্গে করিমের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু এখানে তা হয়নি। প্যাঁকালে বা মেজ বউ কেউই রাজী হয়নি। প্যাঁকালে কুর্শির সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত। সে-ই এমন প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কিন্তু পারিবারিক পরিকল্পনাটা পাড়াতেও চাউর হয়ে গিয়েছে। গোলপুকুরে স্নান করতে গিয়ে প্যাঁকালে যখন কুর্শির ঘনিষ্ঠ হতে চাইল, তখন কুর্শি বলে উঠল, '...এখন তোর কুর্শিকে না হলেও চলবে। তোর ঐ মেজ ভাবী ত আমার মতন কালো নয়। তা হোক না ছেলের মা। এবার প্যাঁকালে বলে উঠল,' আল্লার কিরে কুর্শি, খোদার কসম্, আমিও নিকে করছিনে। আমাকে বলেছিল মা, তা আমি আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছি মুখের মতন।'[৭২]

কাহিনীতে লেখক মেজ বউ-এর সঙ্গে প্যাঁকালের নিকে ঘটাননি। তা করলে এ কাহিনী গতি হারাতো, মেজ বউ চরিত্রের বিকাশ আর ঘটত না। আকবরউদ্দীন সাহেবের বিবরণ মতে নজরুল ইসলাম সেদিন খুশি হননি করিমের সঙ্গে নাসরিন বিবির বিয়েতে। কাজীর দুর্বলতা জন্মেছিল নাসরিনের প্রতি, তার রূপ, আচরণ এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কারণে। তাই কাহিনীতে মেজ বউ-এর সেই চরিত্র বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিয়ে হয়ে গেলে মেজ বউতো হারিয়ে যেত। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। লেখক তাঁর কাহিনীতে হাবিবের মা, কামিনী, করিম—সকলকেই অন্য নামে নামাঙ্কিত করেছেন। হাবিবের মা হয়েছে গজালের মা, কামিনী হয়েছে হিড়িম্বা, করিম হয়েছে প্যাঁকালে। কিন্তু মেজ বউ-এর কোন নামকরণ করেননি। সে শুধুই মেজ বউ। সিস্টার মিস জোন্স তার নাম জানতে চাইলে সে বলেছে, নাম একটা ছিল, এখন আমি মেজ বউ। এভাবে লেখক নাসরিন বিবিকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। অতঃপর এই বাস্তব চরিত্রগুলো নিয়ে কাহিনীর যাত্রা শুরু হলো। বিশেষত প্যাঁকালে আর মেজ বউকে নিয়ে।

চাঁদিসড়ক পল্লীর কাহিনীতে মেজ বউ চরিত্রই প্রধান। বস্তুত তাকে কেন্দ্র করেই কাহিনীর অগ্রগতি।

সেজ বউ আর তার নবজাত শিশুপুত্র রোগশয্যায়। চিকিৎসা নেই, পথ্য নেই। ঘরে শুয়ে ধুঁকছে, মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। সেখানে সহসা একদিন পাশের রোমান ক্যাথলিক গীর্জা থেকে পাদরী সাহেব আর সিস্টার নার্স মিস জোন্স এসে উপস্থিত হলেন ওদের চিকিৎসার জন্য। বাড়িসুদ্ধ সকলে সন্ত্রস্ত হলো, সাদর অভ্যর্থনা জানাল পাদরী সাহেবকে।

সায়েব রোগী দেখল, ওষুধ দিল, আশ্বাস দিল। প্যাঁকালের মা বলল, 'খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব।···যদি ভালো করতে পার, কেনা গোলাম হয়ে থাকব তাহলে।' এরপর সায়েব মেম রোগী পরীক্ষা করে ওষুধ দিয়ে চলে গেল। বলে গেল আবার বিকালে আসবে। প্যাঁকালের মা ওষুধগুলো দেখছিল। মেজ বৌ বললে, 'মেমসায়েব যাবার বেলায় একটা টাকা দিয়ে গেছে, সেজ বৌর পথ্যি কিনতে। বলেছে বেদানার রস খাওয়াতে।' বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগল। মেজ বৌ কাঁদতে লাগল, 'কপালে এত দুঃখুও লিখেছিলে আল্লা। সেজ বৌর যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় দুটো আঙুর কি একটা বেদানা কিনে দিতে পারলুম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝেঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে। সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়।' শাশুড়ীও কেঁদে বলে 'যা বলেছিস।' এখানেই মোড় ঘুরল কাহিনীর। আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাবার পথ তৈরী হলো।

সেজ বউ আর তার শিশু পুত্র কেউই বাঁচল না।

তাদের মৃত্যু হলে মিস্ জোন্স শোকার্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাতে এলো। তার সহানুভূতিপূর্ণ কথায় আচরণে মেজ বউ ক্রমেই তার প্রতি আকৃষ্ট। বাড়ির দুঃখ-দুর্দশা, পাড়ার লোক কেউ ফিরে তাকায় না, প্যাঁকালে সত্যিই কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে গিয়েছে কলকাতায়, সেখানে রাজমিস্ত্রীর কাজ করছে, ক'মাস হলো। দু'বার টাকা পাঠিয়েছে। প্যাঁকালের এই চলে যাওয়াটাও মেজ বউ ভালো মনে নিতে পারে না।

পাড়ায় রটেছিল মেজ বউ-এর সঙ্গে তার নিকে হবে। এই মিথ্যা রটনার ভয়েই সে পালিয়েছে বলে তার ধারণা। অন্যদিকে নানা পুরুষের তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি মেজ বউকে বিব্রত করে তুলেছিল। সে পথ খুঁজছিল এই দুঃসহ পরিবেশ থেকে মুক্তির। কিভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সে তার ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে একটু শান্তিতে থাকতে পারবে এবং দুঃখী পরিবারকে রক্ষা করবে। পুরুষ প্যাঁকালে যেখানে পলাতক, সেখানে নারী হয়েই সে সংগ্রাম করে দেখাবে। এই সময়েই মিস্ জোন্স তাকে প্রস্তাব দিল লেখাপড়া এবং সূচীশিল্প শেখার। এজন্য তাকে খৃষ্টান হতে হবে না। রোজ সকালে গীর্জায় তার কাছে গিয়ে শিখবে, দুপুরে বাড়ি ফিরবে। তার ছেলেমেয়েকেও লেখাপড়া শেখাবে। মেজ বউ যেন হাতে চাঁদ পেলো। সে রাজী হলো এবং মিস জোন্সের কাছে যাতায়াত শুরু করল।

কিন্তু শেষ অবধি মেজ বউ চাঁদ সড়কের মুসলমান সমাজের আচরণেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। এবার তার নামকরণ হলো হেলেন। সে কিন্তু তার ছেলেমেয়েকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করল না। তারা তো তাদের বাপের এবং পরিবারের সম্পত্তি। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও মেজ বউ-এর কিন্তু পাড়ার প্রতি, শ্বশুর বাড়ির প্রতি আকর্ষণ করেনি। এটা লক্ষ্য করেই গীর্জা কর্তৃপক্ষ তাকে কৃষ্ণনগরে রাখা সঙ্গত মনে করল না। তাকে ওদের বরিশালের প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিল। ইতিমধ্যে প্যাঁকালে ফিরে এসেছিল বাড়িতে। খৃষ্টান মেয়ে কুর্শির সঙ্গে তার প্রণয়ের সূত্রে তাকেও খৃষ্টান করে কুর্শির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখন তাদেরও মেজ বউ-এর সঙ্গে বরিশাল পাঠিয়ে দেওয়া হলো। মেজ বউ তার ছেলেমেয়েকে শাশুড়ীর কাছেই রেখে গেল। তারা তো খৃষ্টান হয়নি। বরিশালে তারা এক বছর ছিল। মেজ বউ-এর প্রবাসজীবন স্বভাবতই সুখকর ছিল না। তার খাওয়া-পরার ভাবনা ছিল না, লেখাপড়া ও সূচীশিল্প শিখছিল। কিন্তু চাঁদ-সড়ক পল্লী, তার পরিবার, ছেলেমেয়ের কথা সে ভুলতে পারত না, যদিও সে মুখে এসব ভাবনার কথা প্রকাশ করত না। প্যাঁকালেদেরও

আর্থিক অনটন ছিল না। পাদরী সাহেবের সুপারিশে ম্যাজিস্ট্রেটের পিওনের চাকরী পেয়েছিল পনর টাকা বেতনে। কুর্শিও একটা কাজ পেয়েছিল প্যাঁকালের চেয়ে বেশি বেতনে।

কিন্তু বছর খানেক পর চাঁদ সড়ক থেকে চিঠি গেল মেজ বউ-এর নামে। শাশুড়ীর চিঠি। মেজ বউ-এর ছেলে মৃত্যুশয্যায়। সেই রাতেই মেজ বউ প্যাঁকালে আর কুর্শি মিশন কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে বরিশাল থেকে কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। চাঁদ সড়কে ফিরে মেজ বউ দেখল আগের দিন ছেলের মৃত্যু হয়েছে। শাশুড়ী ধুঁকছিল। তার মৃত্যু হলো তাদের বাড়িতে পদার্পণের একটু পরেই। এর পরের ঘটনা হলো, প্যাঁকালে আবার মুসলমান ধর্মে ফিরে এলো। মধু ঘরামী মুসলমান ধর্ম ছেড়ে খৃষ্টান হয়েছিল। সে মারা গিয়েছে। কুর্শি আর খৃষ্টান হয়ে থেকে কি করবে? সেও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে প্যাঁকালের সংসারে ফিরে এলো। আর মেজ বউ? সেও শেষ অবধি আবার ধর্মে ফিরে এলো। অতঃপর চাঁদসড়ক পল্লীর কাহিনীর সমাপ্তি ঘটল। এটাই হচ্ছে চাঁদসড়ক পল্লীকেন্দ্রিক মূল কাহিনী। মেজ বউ মিশনারিদের কাছে লেখাপড়া শিখেছিল। সেই বিদ্যা নিয়ে সে এখন চাঁদসড়ক পাড়ায় বিদ্যালয় খুলে, পাড়ার শিশুদের, বালক বালিকাদের শিক্ষাদান করতে লাগল। বাস্তব চরিত্রের উত্তরণ ঘটিয়ে এই পরিণতি টানাই হচ্ছে ঔপন্যাসিক কাজী নজরুল ইসলামের কীর্তি বা কৃতিত্ব। এটাই তাঁর তৎকালীন মানসলোকের পরিচয়।

বার

কাজী নজরুল ইসলাম চাঁদসড়ক পল্লীতে বাস করেছেন আড়াই বছর। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে। উপন্যাসটি লেখা শুরু করেছিলেন ১৯২৭ সালে। জানা যায় যে উপন্যাসটি তিনি একটানা লেখেননি। ধীরে সুস্থে লিখেছেন। গ্রেস কটেজ বাড়িটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হলেও সেটি চাঁদসড়ক পল্লীরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওই পল্লীর মানুষের সঙ্গে তিনি মেলামেশাও করতেন। ফলে স্থানীয় কথ্য

ভাষাকে তিনি ভালো ভাবেই জানার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপন্যাসটিকে বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে যথাসাধ্য কথ্য ভাষাই বলিয়েছেন। ফলে চরিত্রগুলো সজীবতা লাভ করেছে, সেই স্থানিক বৈশিষ্ট্যও বজায় থেকেছে। আঞ্চলিকতার স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে। মনে হয় চাঁদসড়ক তথা কৃষ্ণনগরে তথা নদীয়া জেলার গ্রাম্য মানুষজনই কথা বলছে।

কলতলার ঝগড়ার মধ্যে খৃষ্টান মহিলা বলছে, 'আমরা আজার (রাজার) জাত।' এরা রাজাকে আজা বলে। রামপ্রসাদকে বলে আমফেসাদ। এমন উচ্চারণ শুধু এরাই করত না। এরা যে গ্রাম থেকে যে সমাজ থেকে এসেছে সেখানেও তখন এই ধারা প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের শ্রমজীবী, চাষী এবং ঘোষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আজও এমন ভাষা প্রয়োগ দেখা যায়। রসিকতা-মূলক একট বিবরণ হচ্ছে—

আমবাবুর রাম বাগানের গাছে একটা রাম পেকেল।
রাকন্দর বেড়া ভেঙে বেড়িয়ে বেড়িয়ে যদি বা পাড়লাম
তা যেমন রাটা তেমন রাঁশ।

মূল কথাটা হচ্ছে: রামবাবুর 'আমবাগানের গাছে একটা আম পেকেছিল আকন্দর এড়ো (জাল) ভেঙে যদি বা পারলাম তা যেমন আঠা তেমন আঁশ।

এই রসিকতামূলক বিবরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে ওই সব গ্রাম্য মানুষের উচ্চারণের প্রবণতাটা কি এই অঞ্চলের। নজরুলও সেটাই দেখিয়েছেন। ওরা উকীলবাবুকে বলে রুকীলবাবু। রুদ্রনগরকে বলে উদ্দনগর। রাতকে আত।

প্রটেস্টাণ্ট খৃষ্টান পল্লী স্থাপিত হয়েছিল ১৮৩৪ সালে। কৃষ্ণনগরে সেটাই প্রথম গীর্জা। তার পরে স্থাপিত রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। প্রটেস্টাণ্ট খৃষ্টান পল্লীকে কেউ বলত ক্রীশ্চান পাড়া, কেউ বলত খৃষ্টান পাড়া, কেউ বলত খেরেষ্টান বা খেরেস্তান পাড়া। তা থেকে মুখে মুখে পরিবর্তিত হতে হতে উচ্চারণের সুবিধার্থে দাঁড়িয়েছিল ছিটেন পাড়া।

আর রোমান ক্যাথলিক হয়েছিল ওমান কাত্‌লি। প্রাক্তন নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় (এখন বাংলাদেশ) একটি গ্রামের নাম ছিল কাথুলি। সেখানে একটি বড় নীলকুঠি ছিল, এককালে অনেক সায়েব মেম থাকত। তাদের অনেকের সমাধি ছিল সেখানে। সম্ভবত সেটা রোমান ক্যাথলিকদের অধিকারে ছিল, তাই গ্রামের নাম হয়েছিল কাথুলি। বিদেশী শব্দ এদেশি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতে গিয়ে ওই রকমই দাঁড়িয়েছিল। যেমন ইংরাজদের কাছে কলিকাতা—ক্যালকাটা, বহরমপুর—বারহামপুর, চুঁচুড়া—চিনস্যুরা ইত্যাদি।

উপন্যাসের মধ্যে নজরুল ইসলাম এই সব স্থানীয় প্রবণতাকে স্থান দিয়ে ইতিহাসের মর্যাদা দিয়েছেন।

কলতলার ঝগড়ায় গজালের মা বলছে, 'ওলো আগ ধুমসী (রাগ ধুমসী) ওলো ভাগলপুরী গাই।'

এই 'ভাগলপুরী গাই' শব্দটি শোনামাত্র সাবেক কৃষ্ণনগরবাসীর আজও মনে হবে এতো পরিচিত, বহুশ্রুত এবং ব্যবহৃত শব্দ। ভাগলপুরী কথাটা সেকালের কৃষ্ণনগরে বহুল প্রচলিত ছিল। লম্বা চওড়া এবং মেদবহুল মহিলাদের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হতো এবং তা শুনে মনে মনে ভাগলপুরের গাভী কেমন তার একটাধারণা করা হতো। কারণ তখন এসব অঞ্চলে দেশি গরু ছাড়া অন্য গরু দেখা যেত না। এখানকার মতো বিদেশি গরু বা সঙ্কর জাতের গরু তো ছিলই না।

কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলার সদর শহর। এখানে জজ ম্যাজিস্ট্রেটই রাজপ্রতিনিধি—শহরে এঁরাই ছিলেন বিশিষ্ট। তবু শহরবাসীরা ম্যাজিস্ট্রেটর চেয়ে জজের কথাই বেশি বলত। জজ সাহেব, সাব জজ—এঁদেরই যেন গুরুত্ব ছিল বেশি। ম্যাজিস্ট্রেট কে আছেন অনেকেই তা বলতে পারতেন না কিন্তু জজের নাম বলতেন। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। কিন্তু কেন এমন তা কে জানে। নজরুলের কাহিনীতেও দেখা যাচ্ছে—গজালের মা বলছে : 'আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল—জজ সায়েবের লো'।—

চাঁদসড়ক পাড়ার মানুষের জীবন জড়িয়ে ছিল ওমান কাতলি

পাড়া, ছিটেন পাড়া আর সাহেব পাড়ার সঙ্গে। পুরুষরা সায়েবদের বাড়িতে কাজ করতো। মেয়েরাও পরিচারিকা কি রাধুনীর কাজ করতো ওই সব পল্লীতে। গজালের মা এক সময়ে কাজ করতো ছিটেন পাড়ার পাদরী মিঃ রামপ্রসাদ হাতির বাড়িতে। আর এক সময় কাজ নিয়েছিল কাঠুরে পাড়ায় সাব ডেপুটির বাড়িতে। এরা কেউ খৃষ্টান, কেউ মুসলমান। এরা শহরের হিন্দু পরিবারে কাজ পেতোনা। কাহিনীতে এটাও একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্যময় দিক, তৎকালীন শহরের সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

পথে ন্যাড়া গয়লা গরুর গাড়ী চালাতে চালাতে গান ধরেছে। হেঁড়ে গলার বেসুরো গান। প্যাঁকালে তার রাজমিস্ত্রী সঙ্গীদের সঙ্গে কাজে যাচ্ছিল। ন্যাড়া গয়লার গান শুনে সঙ্গী রাজমিস্ত্রী জনাব বলে উঠল, 'উঃ শালার গলাত নয় যেন, হাঁড়োল।'

এম. এস. আকবরউদ্দীনের প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, নাসরিন বিবির লোভে রাতের অন্ধকারে বাবু এসে বেলতলায় দাঁড়িয়েছিল, তারপর ভয় পেয়ে বাবু যখন পালাতে লাগল তখন পাড়ার ছেলেরা হাঁড়োল হাঁড়োল বলে তার পিছনে ধাওয়া করেছিল। এ প্রসঙ্গে আকবরউদ্দীন লিখেছেন :

'নজরুল হাসতে হাসতে বললেন, হাঁড়োল শব্দটি অমর হোক। কী শব্দই না বের করেছে এ পাড়ার লোকেরা। হাঁড়োল শব্দটি নজরুল অমর করতে চেয়েছেন মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে ওই ভাবে প্রয়োগ করে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে 'হাঁড়োল' শব্দটি নজরুল ইসলাম চাঁদসড়ক পাড়ায় প্রথম শুনলেও, শব্দটি চাঁদ সড়ক বাসীর আবিষ্কৃত নয়। নদীয়া জেলায় শব্দটি বহুল প্রচলিত। বিদ্রূপাত্মক শব্দ। মেহেরপুরে (এখন বাংলাদেশ) জগন্নাথ প্রামাণিক বলে একজন ছিলেন। তাঁকে লোকে বলত জগো হাঁড়োল। কারণ তাঁর চেহারাটির ছিল মাটির জালা বা হাঁড়ীর মতো বেঢপ আকারের। সম্ভবত হাঁড়া থেকে শব্দটি এসেছে। এছাড়া সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত বাঙলা অভিধানে আছে :

'হাঁড়োল—নেকড়ে ও বাঘের মধ্যবর্তী প্রাণী বিশেষ। ইহারা

গৃহপালিত হাঁস মুরগি চুরি করিতে অভ্যস্ত।'

এ থেকে বলা যায়, শব্দটি নজরুলের কানে নতুন ঠেকলেও চাঁদ সড়কের মানুষের প্রবর্তিত নয়। এর ব্যবহার নদীয়া জেলাতেই ছিল। অন্যত্রও থাকা সম্ভব। তবু যাহোক নজরুল তাঁর কথামতো শব্দটিকে উপন্যাসে ব্যবহার করে অমরত্ব দিতে চেয়েছেন। এটা তাঁর আন্তরিকতা ও ক্ষমতারই পরিচয়। ব্যবহারও করেছেন লাগসই ভাবে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে কলতলার ঝগড়ার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তার ভিতরেই চাঁদসড়ক পল্লীর মূল পরিচয় ও তার বৈশিষ্ট্য সংহত, সংক্ষিপ্ত অথচ সহজ সাবলীলভাবে পরিবেশিত হয়েছে। বাকি অংশ তারই সূত্র ধরে লেখকের পরিকল্পনা মতো গড়ে উঠেছে, নানা ঘটনা ও চরিত্রের ভিতর দিয়ে। ওই ঝগড়ার ভিতর আছে তাদের জাত্যাভিমান, ভ্রান্তি, দুঃখ বেদনা। নানা অপকীর্তি-কথা, তাদের বাচনভঙ্গী, ভাষা এবং রঙ্গ রসিকতা।

কলতলায় ঝগড়া চলছিল। 'ওরই মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচারে—উই শালা পচা। ছুটে আয়রে, ছুটে আয়। তোর দিদিমা কালী হয়ে গিয়েছে।'[৭৫]

এই আহ্বানবাণী শুনলে আজও সাবেক কৃষ্ণনগরবাসী চিনে ফেলবে —এতো আমাদের শহরের কথা বলে। উই শালা পচা—কৃষ্ণনগরের বাচনভঙ্গীর এক বিশেষ রূপ। শুধু এইটুকুই নয় কলতলার সমগ্র বিবরণই যেন অতীত কৃষ্ণনগরের জনজীবনের একটি জীবন্ত চিত্র।

এরপর আসে কাহিনীর নানা চরিত্রের নামকরণ প্রসঙ্গ। নামগুলো লক্ষণীয়। গজালে, প্যাঁকালে, হিড়িম্বা, পুঁটে, মুলো, পাঁচি, সোনা, কুরচে, গুয়ে, রেতো, ন্যাড়া ইত্যাদি। নামগুলো আরোপিত এবং ইঙ্গিতবহ। ইঙ্গিতটা এই যে—যাদের জীবন প্রায় মনুষ্যপদবাচ্য নয়—অবহেলিত, অসহায়, দরিদ্র সমাজের মানুষ যারা, তাদের নামকরণও হয় এই রকম কিম্বা এই রকম হওয়া উচিত। নামই তাদের পরিচয় বহন করবে। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হবেনা—বা হওয়া উচিত নয়। কিম্বা তাদের জনকজননী ওসব চিন্তা জগতের বাইরের

মানুষ। যেমন মেজ বউ-এর ভগ্নীপতি যখন গোয়াড়িতে ঘোড়ার গাড়ি চালাত তখন তার নাম ছিল ঘাসু মিঞা। কলকাতায় গিয়ে চামড়ার ব্যবসা করে ধনী হলে তার নাম হয়েছে ঘিয়াসুদ্দিন। এখন সে মনুষ্য পদবাচ্য হয়ে মানুষের নাম পেয়েছে। ঘাসু কোন মানুষের নাম নয়। ওই নামগুলোও সেই রকম। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মীর মশারফ হোসেনের কথা। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে পড়তে এসে কিছু-কাল গোয়াড়িতে বাস করেছিলেন। তৎকালীন কৃষ্ণনগর সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন তাঁর 'আমার জীবনী' গ্রন্থে। 'আমার জীবনী' গ্রন্থের 'বংশ পুরাণ' অধ্যায়ে কৃষ্ণনগর প্রসঙ্গ আছে। সেখানে নাম-করণ প্রসঙ্গ তিনি লিখেছেন, 'মুসলমান যাহারা কৃষ্ণনগরে আছেন (আমি সেই সময়ের কথা বলিতেছি) পরণ পরিচ্ছদও হিন্দুয়ানী, চাল-চলন হিন্দুয়ানী, রাগক্রোধ হিন্দুয়ানী, কান্নাকাটি হিন্দুয়ানী, মুসলমানের নামও হিন্দুয়ানী যথা—সামসুদ্দিন-সতীশ, নজমাল হককে—নজু, বোরহান বিরু, লতিফ—নতু-মশারফ—মশা, দায়েম-ডাঁশ, মেহদি-মাছি, ফজলল-করিম—ফড়িং এই প্রকার নামে ডাকা হয়।'[৭৬]

নামগুলি মুসলমানী নয় ঠিকই কিন্তু নজু, নতু, মশা, ডাঁশ, মাছি, ফড়িং কি হিন্দুয়ানী বা হিন্দু নাম? নাকি ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকাশ? এ প্রসঙ্গে সেকালের অর্থাৎ আরেক সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) কৃষ্ণনগর বাসকালের অভিজ্ঞতা হচ্ছে: '...আমার ছেলেবেলায় কৃষ্ণনাগরিকরা পঞ্জিকাশাসিত ছিলেন না;...তাঁদের মধ্যে ধর্ম্মের গোঁড়ামি ছিলনা। অধিকাংশ লোক এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। যদিচ কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের পাশের নগর, তবুও সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোনও ভক্তকে আমি দেখিনি। কৃষ্ণনাগরিকরা ব্রাহ্ম ছিলেন না। দু একজন ছাড়া। সুতরাং কোনও ধর্ম্মের গোঁড়ামি আমাদের কান মন স্পর্শ করেনি। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক মতামত থেকে আমরা মুক্ত ছিলুম। এর ফলে মানসিক খোলা হাওয়ায় আমরা বাস করতুম। সব জিনিস হেসে উড়িয়ে দেওয়া তাদের স্বাভাবিক ছিল। ঠাট্টা জিনিসটেরই তারা চর্চা করত।"[৭৭]

মীর মশারফ হোসেন যখন কৃষ্ণনগরে পড়তে এসেছিলেন তখন কলিজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলেন সম্ভবত উমেশচন্দ্র দত্তগুপ্ত। তখন কৃষ্ণনগরে ছাত্র-যুব-সমাজে রামতনু লাহিড়ীর প্রভাব পুরোদমে বহে চলেছে। যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার যাঁরা প্রচারক ছিলেন সর্বপ্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরোধী। শহরে বইছিল মুক্ত হাওয়া। অন্যদিকে মীর মশারফ হোসেন ছিলেন কুমারখালির লাহিড়ীপাড়ার অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সন্তান। মুসলমানী রীতিনীতিতেই অভ্যস্ত ছিলেন। কৃষ্ণনগর বা এই অঞ্চলে সেই তাঁর প্রথম আগমন। ফলে তখন তিনি এ অঞ্চলে যা দেখেছেন তাতেই বিস্মিত হয়েছেন। তখন কৃষ্ণনগরের রেলস্টেশন ছিল বগুলা। বগুলাতে নামার পর থেকে তিনি যা দেখেছেন তাতেই বিস্মিত হয়েছেন। নদীর ঘাটি, নৌকার ওপর ঘোড়ার গাড়ি উঠে যাওয়া, ঘোড়ার গাড়ির চালকদের মুখের বাঙলা ভাষা—তার উচ্চারণ—সবেতেই তিনি বিস্মিত। সেই বিস্ময় শহরের মুসলমানদের নামকরণ শুনেও। মুসলমানী নয় ঠিকই, কিন্তু তা যে হিন্দুয়ানীও নয়, ধর্ম নিরপেক্ষ এক সমাজ পরিচয়ের প্রকাশ, এটা তিনি সে সময় ঠিক ধরতে পারেননি বলেই মনে হয়। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে, কৃষ্ণনগরের মানুষের নামকরণের এটা এক বিশেষ পরিচয় বা প্রবণতা বা ধারা বলে ধরা যেতে পারে। নজরুল কি সেই ধারাকেই অনুসরণ করেছেন কাহিনীর চরিত্রগুলোর নামকরণের ক্ষেত্রে? মনে প্রশ্ন জাগে। দরিদ্র অসহায় বলেই অমন নামকরণ? কৃষ্ণনগরে আজও দেখা যায়—কালীচরণ অমন বিশুদ্ধ হিন্দুয়ানী নাম হয়ে যায় কেলো বা কেলে, ভোলানাথ হয় ভুলো বা ভোলা, নিতাই-নিতে, সরস্বতী-সরি, বলরাম-বলা, ধর্মদাস-ধামা। প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তর ডাক নাম—মঘা—অনেকে হয়ে যায় পেমা। এক্ষেত্রে শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র ভেদ মেলেনা। এছাড়া, হেবো, ন্যালা, কেনো, খ্যাঁকা, ভুজো, ঘসা, মানা ইত্যাদি নামের অধিকারীরা অনেকেই বিশিষ্ট পরিবারের সন্তান, নিজেরাও বিশিষ্ট। বলাবাহুল্য এসব ডাকনাম। পোশাকী নাম অবশ্যই গালভরা। প্যাঁকালে গজালের ক্ষেত্রেও

অবশ্যই পোশাকী মুসলমানী নাম ছিল। এস. এম. আকবরউদ্দীনের পুত্র কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রদ্ধেয় এম. এস. বদরুদ্দিন সাহেবের কাছে মার্জনা চেয়ে নিয়ে জানাচ্ছি, তিনি যে চাঁদসড়ক পল্লীতে লালিত হয়েছেন, সে পাড়ার প্রবীণেরা তাঁর সম্পর্কে বলেন আমাদের বদা। এভাবে বলতেই তাঁরা অভ্যস্ত।

অর্থাৎ নজরুল ইসলাম তাঁর উপন্যাসে কৃষ্ণনগরের মানুষের নামকরণের সহজ স্বাভাবিক প্রবণতাকেই অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। অবশ্যই এ প্রবণতা কৃষ্ণনগরের একচেটিয়া নয়।

কৃষ্ণনগরের একটেরে পড়ে থাকা চাঁদসড়ক পল্লীর কথা লিখতে গিয়ে লেখক তাই বলে কৃষ্ণনগরের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরতে ভোলেননি। লেখার ভিতর দিয়ে তিনি জানাতে চেয়েছেন যে চাঁদসড়ক একটেরে পড়ে থাকলেও আপাতবিচ্ছিন্ন হলেও, পল্লীবাসী মূল শহর-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কাহিনীর সূচনায় প্রথম বাক্যই হচ্ছে: 'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর।'

আবার একদিন যখন প্যাঁকালে, কুর্শি, মেজ বউ কৃষ্ণনগর ছেড়ে বরিশাল চলে গেল, তখনও লেখক লিখেছেন, 'সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর। সেই ধুলো কাদার চাঁদসড়ক। শুধু সড়কই আছে, চাঁদ নেই।'[৭৮] কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের সঙ্গে কাহিনীর প্রত্যক্ষ কোন যোগ মেলে না। তবু কেন বারংবার এর উল্লেখ? মনে হয় লেখক মাটির পুতুলকে কৃষ্ণনগরের প্রতীক হিসাবে ধরেছেন। অর্থাৎ মৃৎশিল্পই এ শহরের সর্বোচ্চ গৌরবের ধন। এই মৃৎশিল্পের জন্যই কৃষ্ণনগর বিশ্ব পরিচিত বা খ্যাত। কৃষ্ণনগরের এই শিল্প ও শিল্পীদের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শহরের পূর্ব প্রান্তে ঘূর্ণী পল্লী। সেখানেই মৃৎশিল্পীদের বাস প্রধানত, অন্তত খ্যাতিমানদের বসবাস সেই পাড়াতেই। নজরুলের কৃষ্ণনগর বাসকালে ঘূর্ণিতে বাস করতেন শিল্পী যদুনাথ পাল। তিনি তখন অতি বৃদ্ধ। তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৃৎশিল্পী। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ইংলণ্ডে গিয়ে বসবাস করতে। তিনি যাননি।

স্বদেশপ্রেমী শিল্পী ঘূর্ণী ছেড়ে, তাঁর পৈতৃক ভিটা ছেড়ে অন্যত্র যেতে সম্মত হননি। এই শিল্পীর সঙ্গে নজরুল ইসলামের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ আছে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থে। 'একদিন কবির সঙ্গে ঘূর্ণী নদীর ধারে সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর করের বাড়ি যাই। সেখানে গান ও আবৃত্তির পর কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প দেখবার জন্য কবি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।'[৭৯] এই বিবরণে একটি ভ্রান্তি আছে। ঘূর্ণী নামে কোন নদী নেই এখানে। নদীর নাম জলঙ্গী। পল্লীটির নাম ঘূর্ণী। নদী ওখানে বাঁক নিয়ে একদা প্রবল ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করেছিল বলেই স্থানের নাম ঘূর্ণী। এই ঘূর্ণীতে চন্দ্রশেখর করের বাড়ি। তিনি পেশায় ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। সাহিত্যিক ছিলেন নেশায়। ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সহপাঠী, বন্ধু। তিনি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকার লেখক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে সাহিত্যিক সমাগম হতো।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মৃত্যুর আগেই কৃষ্ণনগর এসে বন্ধুর বাড়িতে উঠেছিলেন বলে জানা যায়। চন্দ্রশেখর করের পুত্রের সহপাঠী বন্ধু ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু ও হেমন্তকুমার সরকার। তাঁরাও আসতেন ওই বাড়িতে।

সেই চন্দ্রশেখর করের বাড়িতে গিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। এখন চন্দ্রশেখর করের সেই বাড়িতে শহরের দমকল বাহিনীর দপ্তর। চন্দ্রশেখর করের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কবি মৃৎশিল্পের কথা জানতে গেলেন যদুনাথ পালের বাড়িতে। বর্তমান জেলা গ্রন্থাগারের পশ্চিমে প্রয়াত জগদীশচন্দ্র রায়ের বাড়ির পশ্চিমসংলগ্ন বাড়িটাই যদুনাথ পালের বাড়ি।

'নব্বই বৎসর বয়স্ক মৃৎশিল্পী যদুনাথ পালের বাড়িতে আমরা আসি। ঐ বয়সেও শিল্পী যদু পাল কথা বলতে বলতে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে কবির একটি আবক্ষ মূর্তি গড়ে দেন। কবি নজরুলও তাঁকে 'প্রণামী' নামে একটি আট লাইনের কবিতা লিখে দেন। বিদায় নেবার সময় নজরুল যদু পালের পায়ের ধুলো নিয়ে আশীর্বাদ চান।'[৮০]

এই গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে পরবর্তীকালে যদু পালের নাতি প্রখ্যাত শিল্পী জি. পাল নজরুলকে কালীমূর্তি তৈরী করে উপহার দেন। নজরুল তখন কলকাতায়। জি. পাল অর্থাৎ গোপেশ্বর পাল। কলকাতায় তাঁর শিল্পকর্মে প্রসিদ্ধি ছিল। কৃষ্ণনগরে ঘূর্ণীতে তাঁর বাড়ি আছে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কৃষ্ণনগরে, পৌরসভা ঘরে, ট্যাক্স দিতে গিয়ে। এই সব তথ্য থেকেই বোঝা যায় নজরুল ইসলাম ঘূর্ণীর এই মৃৎশিল্পের প্রতি কতটা শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। তাই উপন্যাসে বার বার উল্লেখিত মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর।

কিন্তু উপন্যাসের সূচনায় প্রথম বাক্য লেখা হয়েছে 'পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর' বাক্যটি লক্ষণীয়। কৃষ্ণনগরের পুতুল নয়, পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর। এরপর লেখা হয়েছে : 'যেন কোনো খেয়ালি শিশুর খেলা শেষের ভাঙা খেলাঘর। খোকার চলে যাওয়া পথের পানে জননীর মত চেয়ে আছে—খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে। এরই একটেরে চাঁদসড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত করে গাছপালার আড়ালে চিনে রাখা।'[৮৯]

এই কাতরতাপূর্ণ বিবরণের সঠিক ব্যাখ্যা কি তা আমার জানা নেই। কবির লেখনীতে এটি একটি কাব্যাংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ আমাকে বলেছেন, ওটা কাব্যই। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কৃষ্ণনগরের পুতুলের কথা মনে রেখে ওটা লেখা।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না। একটি উপন্যাসের সূচনাতেই এমন একটি বর্ণনা নিছক উদ্দেশ্যহীন হওয়া সম্ভব নয়। আমার ধারণা, কবি, কৃষ্ণনগর শহরের তৎকালীন রূপকেই তুলে ধরেছেন এই বর্ণনার ভিতর দিয়ে। কৃষ্ণনগর শহর একদা ছিল অতি সমৃদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর স্থান। রাজার শহরে চৌধুরী পাড়া, মাঝের পাড়া, বৈকুণ্ঠ সড়ক ইত্যাদি পল্লী ছিল ধনে জনে পরিপূর্ণ। তারপর একসময় এ শহরে নেমে এলো ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রতাপ। মহামারী রূপ হলো তার। পাড়াকে পাড়া উজাড় হয়ে গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়-চন্দ্র রায় পৈতৃক বাড়ি ঘর ছেড়ে গোয়াড়িতে এসে বাসা করলেন,

রামতনু লাহিড়ী ম্যালেরিয়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে বাংলার বাইরে বিহার অঞ্চলে গিয়ে হাওয়া বদল করতে লাগলেন। শেষে কৃষ্ণনগর ছেড়ে কলকাতায় চলে গেলেন। আরও যাঁরা প্রাণে বাঁচলেন তাঁরা অনেকেই কৃষ্ণনগর ছেড়ে গেলেন। মাঝের পাড়া, চৌধুরী পাড়া, বৈকুণ্ঠ সড়ক (শক্তিনগর অঞ্চল) হয়ে পড়ল পরিত্যক্ত, অরণ্যময়। বড় বড় অট্টালিকা জনশূন্য—যেন প্রেতপুরী। একদা রাজা ছিলেন সম্পদ-শালী। শহর জুড়ে তাঁদের কতো কীর্তি-গৌরব-স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। সে রাজা নেই, রাজসম্পদ নেই, সবই অবহেলিত, বিবর্ণ, ম্লান, ধূসর। এই শহরেরই একটেরে চাঁদসড়ক পল্লী, গাছপালার আড়াল দিয়ে ঢাকা। দরিদ্র অসহায় পল্লী—দুঃখের সংসার—তাই আড়াল ঢাকা গোপন ব্যথার মতো। কবি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কৃষ্ণনগর ও চাঁদ সড়ককে দেখেছেন বলে মনে হয়। তাই লিখেছেন, পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর এবং তারপর ওই বর্ণনা। কৃষ্ণনগর শিশুর খেলাঘরের মতো গড়ে উঠেছিল, শিশুরা খেলা করেছিল। এখন শিশুর পরিত্যক্ত সেই খেলাঘর—এর দিকে তাকিয়ে আছে শহর জননীর মতো, স্মৃতিভার নিয়ে।

অন্য আরেক চিন্তাও মনে জাগে। কবি কৃষ্ণনগরে এলেন। গোলাপটিতে বাস করলেন। তখন কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলন-গুলো অনুষ্ঠিত হলো, কতো হৈচৈ, ব্যস্ততা, কতো আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ স্বপ্ন দেখা। সম্মেলনগুলো স্বর্ণপ্রসূ হবে। বাস্তবে ঘটল বিপরীত ঘটনা। পর্বতের মুষিক প্রসবের মতো। সব কেমন ভেস্তে গেল, ভণ্ডুল হয়ে গেল। সব যেন ছেলেমানুষী, ছেলেখেলা। সেসব শেষ হয়ে গেল। কবি গোলাপটি ছেড়ে চলে এলেন গ্রেস কটেজে। উপন্যাস রচনাকালে কবির মনে পড়ছে সেই দুঃখে ভরা স্মৃতিকে। কতো ছেলে-খেলাই হলো। সেসব চুকে গেল। কৃষ্ণনগর শহর জননীর মতো তাকিয়ে শিশুর পরিত্যক্ত সেই খেলাঘরের দিকে। কবির মনে তারই বেদনা, কাতরতা। চাঁদসড়ক পল্লী সেই কৃষ্ণনগর থেকে দূরে আড়ালে —দুঃখময় আরেক চিত্র এখানে।

যে উদ্দেশ্যই ওপরেই ওই বিবরণ লেখা হয়ে থাকুক, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই মাটির পুতুলকেই তিনি কাজে লাগিয়েছেন তাঁর বক্তব্য পেশ করতে। অর্থাৎ লেখকের কাছে মাটির পুতুলই কৃষ্ণনগরের পরিচয়।

কৃষ্ণনগরের আরেক বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখিত হয়েছে উপন্যাসে। রোমান ক্যাথলিক মিশন থেকে মেজ বউদের বরিশালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তারা সেখানে আছে। মেজ বউ-এর সঙ্গে আছে আরও ক'জন ধর্মান্তরিতা তরুণী। কেউ মুসলমান থেকে ধর্মান্তরিতা, কেউ হিন্দু থেকে। কেউ বিধবা, কেউ স্বামী-ত্যাগিনী। এরা প্রায় সমবয়সী। একদিন বিকালে ওরা চার জন বেড়াতে বেরিয়ে নদীতীরে রাস্তার ধারে একটা ভাঙা পুলের ওপর বসল। তারা এখন খৃষ্টান। তাদের পরণে কালাপেড়ে শাড়ী, মাথায় বাঁকা সিঁথি, পায়ে হিল তোলা স্যু। মেজ বউ দূরে ঘাসের ওপর বসেছিল, একা। অন্যরা তাকে কাছে টেনে এনে তার উদ্দেশ্যে নানা মন্তব্য করতে শুরু করল। মেজ বউও তার যোগ্য উত্তর দিতে থাকল। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর পর্বে মিনতি নামের মেয়েটি মেজ বউ-এর ওই সব লাগসই উত্তর শুনে বলে উঠল, 'মেজ বৌও কথা শিখেছে দেখছি।' এর উত্তরে মেজ বউ হেসে বলল, '…আমরা কৃষ্ণনগরের মেয়ে ভাই, আমাদের কথা শিখতে হয় না। মায়ের পেট থেকেই কথা শিখে আসে আমাদের দেশের মেয়েরা।'[৮২]

প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) মশায় তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন: 'যার মুখের ভাষা ভাল, সেও সে ভাষাকে ইচ্ছা করলে বাঁকাতে ঘোরাতে পারে। ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতার সন্ধান কৃষ্ণনাগরিকরা জানতেন। এরই নাম বাকচাতুরী।…আমার লেখার ভিতর যদি বাক-চাতুরী থাকে তার জন্যে আমি কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী।'[৮৩]

প্রমথ চৌধুরী মশায়ের এই বক্তব্যেরই যেন প্রতিধ্বনি বা পুনরুক্তি বা সমর্থন ঘোষিত মেজ বউ-এর উক্তিতে। অর্থাৎ নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরের এই গৌরবময় ঐতিহ্যেরই ঘোষণা জানিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট

চরিত্র মেজ বউ-এর জবানীতে। এই সঙ্গে এটাও বলা হয়েছে যে চাঁদসড়ক পল্লী যতই একটেরে পড়ে থাকুক এবং এই পল্লীর একটি দরিদ্র মজুর পরিবারের যত সাধারণ বধূই হোক, কৃষ্ণনগরের ভাষা ও সংস্কৃতির সেও সমান অংশীদার। ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ঐতিহ্য-বোধে শহর ও সমাজ এক ও অবিচ্ছিন্ন। নজরুল ইসলাম এখানে সামান্য অবসরে অসামান্য কথা জানিয়ে দিয়ে কৃষ্ণনগরের যথার্থ গৌরবের অধিকারী করেছেন। তিনিও কৃষ্ণনগরের এই বাক্‌চাতুরীকে স্বীকার করেছেন।

এই ভাবেই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে চাঁদসড়ক তথা কৃষ্ণনগরের স্থানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আশ্রিত হয়েছে। তাই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস কৃষ্ণনগরের ইতিহাস ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ঐতিহাসিক গ্রন্থ, জনসংস্কৃতির পরিচয় বাহক।

তের

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আছে দুটি কাহিনী। দুটি ধারা। একটি চাঁদসড়ক পল্লীর জনজীবন কথা। যা প্যাঁকালে মেজ বউদের পরিবারকেন্দ্রিক। আরেকটি কাহিনী চাঁদসড়ক পল্লীতে আসা বহিরাগত কয়েকটি চরিত্র-কেন্দ্রিক। চাকরীসূত্রে বদলী হয়ে কৃষ্ণনগরে এসে চাঁদসড়কে বাসা নিয়েছিলেন এক নাজির সাহেব। মুসলমান ভদ্রলোক। একদিন তাঁর বাসায় আবির্ভাব ঘটল এক বিপ্লবী যুবকের। তার নাম আনসার। নাজির সাহেবের স্ত্রী লতিকা, ডাক নাম বুঁচি। এই বুঁচি ওই বিপ্লবীর খালেরা বহিন (মাসতুতো বোন)।

আনসার সম্ভ্রান্ত ধনী-পরিবারের সন্তান। উচ্চশিক্ষিত। গৃহ সংসার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধনসম্পদ—সব কিছু ত্যাগ করে বা তুচ্ছ করে বিপ্লবী জীবন গ্রহণ করেছে। প্রথমে কংগ্রেস করতো। চরকায় সুতো কাটত। এখন সে সবে বিশ্বাস হারিয়ে বলশেভিক চিন্তায় আশ্রয় নিয়েছে, অর্থাৎ কম্যুনিজমে বিশ্বাসী। সে এখন দেশের নানা স্থানে গণজাগরণ ঘটানোর কাজে লিপ্ত। পূর্ববঙ্গের নানা শহরে কাজ করার পর

কৃষ্ণনগরে এসেছে। কৃষ্ণনগরের শ্রমজীবী সমাজ—মুটে মজুর মেথর ঝাড়ুদার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কচুয়ান সহিস, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী ইত্যাদির সংগঠিত করে তাদের ভিতর জাগরণ আনবে। সে নাজির সাহেবের বাড়িতে ওই সব কাজ করতে লাগল। কিন্তু সরকারী পুলিশ বাহিনী এবং গোয়েন্দারা তাকে সে কাজ করতে দিল না। একদিন এই পুলিশ বাহিনী নাজির সাহেবের বাসা ঘিরে ফেলল এবং বিপ্লবী আনসারকে বিপ্লবী কাজের অভিযোগে গ্রেপ্তার করল। খুব হট্টগোল হলো। শ্রমিকরা ছুটে এসে পুলিশকে বাধা দিল। কিন্তু আনসার বক্তৃতা দিয়ে তাদের শান্ত করে, গ্রেপ্তার বরণ করল। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে চলে গেল।

আনসার চলে যাওয়ার পরই নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এলেন এক মুসলমান ভদ্রলোক, যাঁর মেয়ে রুবি হচ্ছে নাজির সাহেবের স্ত্রী লতিকার বান্ধবী। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কৃষ্ণনগরে আসার পর দিনই তাঁর বিরাট মটর গাড়ি এসে দাঁড়াল চাঁদসড়কে নাজির সাহেবের বাসার সামনে। গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো রূপসী তরুণী রুবি। লতিকা তাকে সাদরে ঘরে নিয়ে গেল। গাড়ী ফিরে গেল। কারণ রুবি রাতে ফিরবে, গাড়ী তখন আসবে।

রুবি ম্যাট্রিক পাশ, প্রাইভেটে আই. এ. দেবে। সে বিধবা। তার বিয়ে হয়েছিল এক উচ্চশিক্ষিত যুবকের সঙ্গে যার আই. সি. এস. পড়তে বিলাত যাবার কথা। সে বিলাত যেতে পারেনি, তার আগেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছে। রুবির ওই বিয়েতে মোটেই সায় ছিল না। বাবা মা তার মত না নিয়েই প্রায় জোর করেই তার বিয়ে দিয়েছিল। রুবি ভালোবাসত আনসারকে। লতিকার কাছে এসে রুবি শুনল যে আনসার এসেছিল, ক'দিন আগেই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। রুবি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল লতিকার। আনসারের কারণেই। উপন্যাসের শেষ পর্বে আনসারের চিঠি এলো লতিকার কাছে। লিখেছে, তাকে রেঙ্গুন জেল-এ বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এখন ছেড়ে দিয়েছে। কারণ সে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। এখন সে ওয়াল-

টেয়ারে এসে আছে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য। রুবি এ সংবাদ শুনে আর স্থির থাকতে পারল না। সে বাবা মাকে ছেড়ে ওয়ালটেয়ার চলে গেল আনসারের সেবা করতে। তারপর একদিন লতিকার কাছে চিঠি এলো রুবির। আনসার মারা গিয়েছে। রুবি তার সেবা করেছে। সে আনসারকে সর্বস্ব দান করেছে। তাকে পরিতৃপ্ত করতে, তার ক্ষুধা মেটাতে সে সব কিছুই দিয়েছে। এখন সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রিনী।

এ কাহিনী লেখকের সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। চাঁদসড়ক পল্লীর জনজীবন কথা যত বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত, এ কাহিনী তেমন নয়, বরং নানা অসঙ্গতিতে পূর্ণ। অসঙ্গতির কথাই আগে ধরা যাক। চাঁদসড়ক পল্লীর যে বিবরণ প্রথম থেকেই লেখক দিয়েছেন এবং যা বাস্তব সত্য সেখানে কোন নাজির সাহেব বাসা ভাড়া নিতে পারেন না। কারণ পাড়ায় নাজির সাহেবের ভাড়া নেবার মতো কোন বাড়িই থাকার কথা নয়, ছিলও না। তাছাড়া পরিবেশের প্রশ্নও আছে। রুবি প্রকাণ্ড মটর গাড়ী চড়ে এলো লতিকার বাসায়। তখন পাড়ার মেয়েরা এসে ভীড় জমাল। বিরক্ত রুবি তাদের ধমক দিল। তাতে তারা সরে গেল। 'লতিকা হেসে বলল, তুই ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে, তাই ওরা অমন চুপ করে গেল, নইলে এমন ভাষায় তোর এই তাড়নার উত্তর দিয়ে যেত যে কানে শীলমোহর করতে ইচ্ছে করত।

রুবি দুষ্টু হাসি হেসে বলল, তাহলে তুই বেশ খাঁটি বাংলা শিখে ফেলেছিস এতদিনে।

লতিকা হেসে ফেলে বললে, হ্যাঁ তা আমি কেন, আমার ছেলে-মেয়েরাও শিখে ফেলেছে। এমন বিশ্রী পাড়ায় আছি ভাই, সে আর বলিসনে। ছেলেমেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল।'[৮৪]

প্রশ্ন হচ্ছে, কৃষ্ণনগর শহরে আগের দিন আসা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ে রুবিকে পরদিন বিকালে চাঁদসড়ক পল্লীর মেয়েরা ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে বলে চিনল কেমন করে? কে বলে দিল? আর রুবি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ে বলেই অচেনা পরিবেশে একটি নতুন

পল্লীর মেয়েদের ধমক দিল। ধমকটা দিতে পারত গাড়ির চালক।

লতিকা চাঁদসড়ক পাড়া সম্পর্কে কতো সচেতন এবং পরিবেশের প্রতি তার গভীর অশ্রদ্ধা। তবু কেন তারা এ পাড়ায় থাকে? লেখক কোন ইঙ্গিত দেননি নাজির সাহেব কেন এই পাড়ায় বাসা নিয়েছেন, কেন এ পাড়া ছেড়ে ভালো পাড়ায় উঠে যাচ্ছেন না। কৃষ্ণনগরে ভালো মুসলমান পল্লীর তো অভাব ছিল না। সেখানে ভাড়া নেবার মতো ভালো ভালো বাড়িও ছিল। এ সম্পর্কে যুক্তি একটাই—উপন্যাসের প্রয়োজনে নাজির সাহেবের এ পাড়ায় আসা এবং থাকা। যে ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাটা কিছু যুক্তিসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং নাজির—সেকালের এই প্রশাসনিক বিভাজনটার কথাও মনে আসে। একজন কেরানী, একজন জেলার কর্তা। মুসলমান হলেই কি সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়? রুবির বাবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে এসেছে, রুবিরাও এসেছে, এ সংবাদ শুনে লতিকা আগ্রহী হয়ে উঠল না, রুবির সঙ্গে দেখা করতে বা স্বামীকে বলল না, রুবিকে আমন্ত্রণ জানাতে তাদের বাড়িতে আসার জন্য? বা বলে আসা যে লতিকা আসবে দেখা করতে। লতিকা গিয়ে রুবিকে নিয়ে এলেই বোধহয় মানাত। কিন্তু রুবিই যে আচমকা চলে এলো লতিকার কাছে লতিকার ঠিকানা কি সে জানত? লতিকার কাছে সে এলো বাপের প্রকাণ্ড মটর গাড়ী চড়ে, সঙ্গে পরিচারিকা। লতিকা যে একজন কেরানীর বউ তা জেনেও। লতিকা তাকে থেকে যেতে বলল। সে থেকে গেল অমনি এবং দুজনে প্রাণের গল্প শুরু করল। এমন কি রান্নার কাজেও হাত লাগাল। খুঁটিনাটি ব্যাপার হলেও কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। লতিকার কাছে মটরে এসেছিল, সঙ্গে ছিল পরিচারিকা, এটা স্ট্যাটাস সিম্বল বলেই ধরা যায়। লতিকার ঘরে ঢুকে সেই রুবির ম্যাজিস্ট্রেট কন্যার ভূমিকা উঠে গেল?

আনসার বিপ্লবী যুবক। লেখক তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। আর বিপ্লবী আনসারের যত তত্ত্বকথা সব তার খালেরা বহিন লতিকা'র (বুঁচির) সঙ্গে। বক্তৃতামতো আনসারের কাজের নমুনা

কোথাও দেখা যায় না। ফলে বক্তৃতাকে কূটকচালি বা আস্ফালন বলে মনে হয়। নাজির সাহেব যেন সন্তান উৎপাদক ও উপার্জনকারী জীব বিশেষ।

আনসার কৃষ্ণনগর এসেছে সংগঠন গড়তে। অপরিচিত বহিরাগত যুবক এতোবড় কাজ একা করতে পারে না। কাদের সাহায্য পেলো; তার উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই কোথাও। বাস্তবে কৃষ্ণনগর শহর তখন অত্যন্ত রাজনীতিসচেতন। গুপ্ত বিপ্লবী দল সক্রিয়, কংগ্রেস কর্মীরা নানা সংগঠন গড়ে তুলেছেন, শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় চলছে, একাধিক। বঙ্গদেশে শ্রমিক আন্দোলনের তখন অন্যতম বিশিষ্ট নেতা কৃষ্ণনগরের হেমন্তকুমার সরকার। যুবক দল সংস্কার সমিতি, দরিদ্র ভাণ্ডারের মতো প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন। সর্বোপরি কৃষ্ণনগর হিন্দুপ্রধান শহর। সেখানে বহিরাগত একজন মুসলমান যুবক আচমকা বলশেভিক চিন্তা ছড়াবে সমাজে, একা—এটা অস্বাভাবিক। ধরে নিতেই হয়, শহরে তার মতাবলম্বী রাজনৈতিক কর্মীরা ছিল। তাদেরই সূত্র ধরে তার কৃষ্ণনগরে আগমন। কিন্তু সে ইঙ্গিত কোথাও নেই। এতো শহর থাকতে খামোকা কৃষ্ণনগরেই বা এলো কেন? সেখানে কলকারখানা, বন্দর ইত্যাদি কিছুই নেই। নিতান্তই একটি পাড়াগেঁয়ে শহর। কৃষি-প্রধান অঞ্চলের শহর।

অথচ দেখা গেল, পুলিশ যেদিন তাকে গ্রেপ্তার করতে এলো, মুহূর্তে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শহরে, আর মুটে মজুর মেথর গাড়োয়ানেরা এসে ঘিরে ফেলল পুলিশকে। কিভাবে আনসার এই প্রভাব বিস্তার করল? এর কোন যুক্তিসম্মত ইঙ্গিত বা বক্তব্য নেই। আরও কথা হচ্ছে, নাজির সাহেব সেই ইংরাজ আমলের একজন সরকারী কর্মচারী। একজন কেরানী। তাঁর বাসায় থেকে আনসার এই সব বৈপ্লবিক কাজকর্ম করে গেল? নাজির সাহেব তাঁর চাকরীর কথা ভেবেও একটু বিচলিত হলেন না? আনসার তাঁর বাসা থেকে ধরা পড়ল, তবু তিনি নির্বিকার? সবই কেমন অস্বাভাবিক। কবিকল্পনা ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। আবেগপ্রবণ কবি নজরুল ইসলাম ভাবাবেগে ভেসে গিয়েছেন এই

কাহিনীতে। পরের অংশে বিপ্লববাদ একেবারে রোমান্টিকতায় পর্যবসিত। আনসার ও রুবি দুই প্রেমিক প্রেমিকা মৃত্যুর দুয়ারে বসে অতৃপ্ত বাসনা-ক্ষুধা মেটাচ্ছে এবং মৃত্যুবরণ করছে। উপন্যাসের নাম হয়ে যাচ্ছে মৃত্যুক্ষুধা। বস্তুত এই চরিত্রগুলো বিকশিত হয়নি, বা হবার সুযোগ পায়নি। কাহিনীর পরিণতি এসেছে ব্যক্তিগত আত্মকেন্দ্রিকতার মধ্যে। ফলে কাহিনী ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

কাজী নজরুল ইসলাম ও চাঁদ সড়ক এই বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশের সঙ্গে কিন্তু এই কাহিনীর অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চাঁদসড়ক পল্লীতে বহিরাগত কোন নাজির সাহেব ছিলেন না, থাকা সম্ভবও ছিল না তখন। তবু লেখক কেন, নাজির সাহেবকে আনলেন ?

উপন্যাসগত কারণ হচ্ছে, কাহিনীর পটভূমি চাঁদসড়ক পল্লী। কিন্তু নাজির সাহেবকে আনলেন কেন ? অন্য কোন পদমর্যাদার কেউ নন কেন ? কোন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সাব জজ জাতীয় কারও স্ত্রী যদি হতো লতিকা তাহলে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে রুবির সঙ্গে মেলা-মেশাটা আরও বেশি স্বাভাবিক হতো। নিদেন কোন উকিলবাবুর স্ত্রী। কিন্তু নাজির সাহেবের কল্পনা লেখকের চিন্তায় এলো কেন ?

মনে হয়, এর কারণ নিকট প্রতিবেশী আকবরউদ্দীন সাহেব। তিনি তখন ছিলেন কৃষ্ণনগর জজকোর্টের অনুবাদক। তাই নজরুলের চিন্তায় নাজির সাহেবের পরিকল্পনা এসেছে। আকবরউদ্দীন সাহেবই কাহিনীর বহিরাগত নাজির সাহেব।

নজরুল ইসলাম 'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে আসবার পর আকবর-উদ্দীন সাহেবের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। (স্থানীয় আইনজীবী এস. এম. বদরুদ্দিন সাহেবের মা)। আকবরউদ্দীনের বাবা পুনরায় ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু আকবরউদ্দীন রাজী হন না। কারণ তাঁর পাত্রী পছন্দ হয় না। আকবরউদ্দীনের বাবা তখন নজরুল ইসলামকে ধরেন ছেলেকে বিয়ের জন্য সম্মত করাতে। নজরুল ইসলাম ঘটকালি করে বিয়ে দিয়ে দেন আকবরউদ্দীনের। বিয়ে হয়েছিল হুগলীতে। সৈয়দ হাসিনুন্নবীর কন্যা সৈয়দা আখতার-

প্রেমার সাথে।

'নজরুল হলেন এ বিয়ের ঘটক। এরই মধ্যে মাসিমার কাছে শুনলাম, তারা হুগলীতে যে বাড়ীতে থাকতেন ঠিক তারই উল্টো দিকের বাড়িটা ছিল আমার হবু শ্বশুর বাড়ী। ঘটনাক্রমে বিয়ে হয়ে গেল। নজরুল ও দোলেনা (প্রমীলার ডাকনাম) উভয়েই বিয়েতে গিয়েছিলেন। নজরুল বিয়ের আসরে গান গেয়েছিলেন আর তার চাইতেও শুনে বিস্মিত হবেন যে, নজরুল নেচেছিলেন। নজরুল নাচতে জানেন, একথা হয়তো কেউ বিশ্বাস করবেন না···নজরুল আমার শ্বশুরকে 'আব্বা' বলতেন।'[৮৫]

এখানে মাসিমা হচ্ছেন নজরুলের শাশুড়ী গিরিবালা দেবী।

এই আখতারুন্নেসা বিবি নজরুলকে দাদাভাই বলে ডাকতেন।

এই তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে আকবর-উদ্দীন সাহেবই হয়েছেন নাজির সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী হয়েছেন লতিকা। তাই চাঁদ সড়কে নাজির সাহেবের আবির্ভাব ঘটেছে। এরপর ভাবতে অসুবিধা নেই যে স্বয়ং নজরুল ইসলামই বিপ্লবী আনসারের ভূমিকায় উপস্থিত। তিনি ব্যক্তিজীবনেও তখন রাজনৈতিক ভাবনায় বলশেভিক চিন্তায় আশ্রিত। 'লাঙল' পত্রিকা চালিয়েছেন। শ্রমিক মজুর কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কৃষ্ণনগরে শ্রমজীবী সম্মেলনে শ্রমিকের গান গেয়েছেন, কৃষ্ণনগরে পেজেন্টস এ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হলে তার কার্যকর সমিতির সদস্য হয়েছেন।

তাই বিপ্লবী আনসার বলশেভিক ভাবনায় ভাবিত।

বাস্তবে জানা যাচ্ছে, মেজ বউ বা নাসরিন বিবির প্রতি নজরুলের মনে দুর্বল ভাব জেগেছিল।

উপন্যাসে মেজ বউ একদিন খৃস্টান হয়ে গেল। পাড়ায় তা নিয়ে তুমুল আলোড়ন। মৌলবী সাহেব সভা বসালেন গজালেদের বাড়িতে। অনেক আলোচনা হলো। আনসার তখন চাঁদসড়কে নাজির সাহেবের বাসায়। সেও গিয়েছিল সভায়, বক্তব্য শুনতে। তারপর সে স্থির করল গির্জায় গিয়ে মেজ বউ-এর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা

করবে যে সে স্বেচ্ছায় খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে, না মিশনারিদের খপ্পরে পড়ে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে।

পরদিন সকালে আনসার গির্জায় গিয়ে দেখা করল মেজ বউ-এর সঙ্গে। মেজ বউ-এর এখন নামকরণ হয়েছে—হেলেন। দেখা হলো এবং দুজনের মধ্যে কথাবার্তা হলো। লেখক এই সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে পরস্পরের প্রতি দুর্বলতা ও আকর্ষণেরই চিত্র ফুটেছে। অর্থাৎ নজরুল ইসলাম গোপন করতে পারেননি বা করেননি নাসরিন বিবির প্রতি তাঁর আকর্ষণের সত্যতাকে। গির্জায় আনসার যখন মেজ বউ-এর ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেতে লাগল, তখন মেজ বউ-এর মনে হতে লাগল, তার এতদিনের এত অহঙ্কার আজ ধুলায় লুটিয়ে পড়ল।...তার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং আরো অতিরিক্ত কিছু তার সুন্দর চোখকে সুন্দর করে তুলেছিল।'

বাস্তবে তো নাসরিন বিবির এই অবস্থাই হয়েছিল নজরুল ইসলামের চেষ্টায় পিছনে লাগা বাবু বিতাড়িত হবার পর।

আর গির্জায় দাঁড়িয়ে মেজ বউ-এর দিকে তাকিয়ে আনসার কি করল? আনসার 'দুই চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে মাধুরী যেন বুভুক্ষুর মত পান করতে লাগল।'

গির্জা থেকে বার হবার পর মেজ বউ-এর সঙ্গে পথে দেখা হলো আবার আনসারের। তখন মেজ বউ বলল, 'কাল সন্ধ্যায় বাড়ী থাকবেন, আমি যেমন করে পারি যাব।' আনসার হেসে বলল, 'ধন্যবাদ মিসেস হেলেন।'

মেজ বউ তিরস্কার ভরা চাউনি হেনে চলে গেল।

আর তার প্রতিক্রিয়া কি হলো?

'আনসারের আজ পথ চলতে চলতে মনে হ'ল এই ধরণীর দুঃখ বেদনা অভাব—সবই যেন সুন্দর, সুমধুর।'

পথে একটি মেয়ে আনসারকে দেখে ঘোমটা দিয়ে চলে গেল। তা দেখে আনসারের মনে হলো 'এই পৃথিবী যেন সুন্দরের মেলা। মনে পড়ল, অমনি সুন্দর—তার চেয়েও সুন্দর রুবিকে, মেজ বৌকে।

তার দু চোখের দুই তারা—প্রভাতী তারা আর সন্ধ্যাতারা—কবি আর হেলেন।'

মেজ বউ-এর প্রতি নজরুল ইসলামের দুর্বলতা—এভাবেই প্রকাশ করেছেন তিনি গ্রন্থমধ্যে।

আর মেজ বউ নাসরিন বিবির দুর্বলতার কথা? লেখক তাও জানিয়েছেন গ্রন্থমধ্যে।

আনসার গির্জায় গিয়ে মেজ বউ-এর সঙ্গে কথা বলে বিদায় নিল। বিদায়কালে মিস্ জোন্স হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করল আনসারের সঙ্গে। কিন্তু মেজ বউ তা পারল না। নমস্কার করতেও পারল না। কারণ আনসারের আকস্মিক আগমন তাকে বিহ্বল করেছিল। এরপরই লেখক জানাচ্ছেন, 'মেজ বউ আনসারকে চিনত এবং একটু ভালো করেই চিনত। কতদিন দূর হতে দৃপ্ত চরণে তারই বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখেছে। এখনি কেন যেন ওর ভালো লেগেছিল এই অদ্ভুত লোকটিকে। কতদিন সে বিনা কাজে লতিকার কাছে গিয়ে বসে থাকত এই লোকটিকে দেখবার জন্য, ওর জীবনের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শোনার জন্য।' এই বিবরণ তো বাস্তবের নাসরিন বিবির দৃষ্টিতে নজরুল ইসলাম স্পষ্ট। পথের ধারে নাসরিন বিবির চালাঘর। সেই পথ দিয়ে সাতাশ আটাশ বছরের রূপবান যুবক নজরুল ইসলাম দৃপ্ত ভঙ্গীতে চাঁদ সড়ক পল্লীতে চলাফেরা করতেন। বিধবা যুবতী তার চালাঘরের ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল কবির প্রতি। নজরুল ইসলাম তখন বাংলার বিখ্যাত কবি। তিনি চাঁদ সড়ক পল্লীতে এসে বাস করছেন। তাঁর কৃতিত্ব গৌরবকথা পাড়ায় ছড়িয়ে পড়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। তা শুনে নাসরিন বিবি আরও আকৃষ্ট, আরও কৌতূহলী। সে বিনা কাজে লতিকার কাছে গিয়ে বসে আনসারকে একটু দেখবার জন্য আর ওই সব অদ্ভুত গৌরবকথা শুনবার জন্য। কাহিনীতে আনসার যেহেতু লতিকার বাড়িতে আশ্রিত, তাই সে লতিকার বাড়ি যেত। বাস্তবে মেজ বউ নাসরিন বিবি নজরুলের গ্রেস কটেজ বাড়িতে গিয়ে প্রমীলা

দেবীর কাছেই বসে থাকত। সেই বাস্তব সত্যকেই লেখক তুলে ধরেছেন গ্রন্থে।

বাস্তব ঘটনা যা জানা যায় তাতে নাসরিন বিবির বিয়ে হয়ে যাওয়াটা নজরুলের পছন্দ ছিল না। কিন্তু পাড়ার লোক করীমের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। তাদের আশঙ্কা হয়েছিল, না হ'লে নাসরিন বিবির সঙ্গে নজরুলের নাম জড়িয়ে গেলে বিশ্রী অবস্থা দাঁড়াবে। নজরুলকে রক্ষা করতেই তারা নাসরিনের বিয়ে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি।

এই পরিস্থিতির ইঙ্গিত যেন কাহিনীতে মেলে।

আনসার গির্জায় গেলে মেজ বউ তার সঙ্গে লতিকার বাড়িতে দেখা করতে বলেছিল। সেই মতো মেজ বউ পরদিন সন্ধ্যাবেলা এসে দেখা করেছিল। আলোচনা হলো দুজনের মধ্যে কিছুক্ষণ। মেজ বউ বলল, আবার মুসলমান হয়ে ফিরে এলে তো পাড়ায় জায়গা হবে না। আনসার বলল, 'তুমি এইখানে আলাদা ঘর বেঁধে থাক, আমি ব্যবস্থা করে দেব যাতে তোমার দিন নিশ্চিন্তে কাটে।'

এরই উত্তরে মেজ বউ বলল, 'আমায় আপনি আশ্রয় দিয়েছেন, জানাজানি হলে আমাদের কি অবস্থা হবে বুঝছেন? সে সবও আমি না হয় সইলাম, কিন্তু আপনি।'

মেজ বউকে দিয়ে এ কথা বলালেও, এটাই ছিল সেদিন চাঁদসড়ক পল্লীবাসীর কথা। নাসরিন বিবি তো অতি সাধারণ দরিদ্র দিন মজুর ঘরের একটি বিধবা বউ। কিন্তু নজরুল? এখানেও সেই কথা—আপনি?

মেজ বউ-এর ছেলের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্ণ হবে, পাড়ায় সব সে ছেলেকে খাওয়াল নিজে রান্না করে। তারপর বিকালে লতিকার বাড়ি গেল। তখন সেখানে রুবিও আছে। আর সেই দিনই আনসারের বিবি এসেছে, তার অসুস্থতার সংবাদ নিয়ে। কথা প্রসঙ্গে লতিকা বলল, 'আজ দাদা-ভাই-এর চিঠি পেলাম কিনা ভাই। তাই মন কেমন যেন হয়ে গেছে···।

মেজ বউ জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর খুব অসুখ বুঝি?'

লতিকা অবাক হলো শুনে, জানতে চাইল যে কেমন করে জানল ?

'মেজ বৌ হেসে বলল, ভয় নেই, তিনি আমায় চিঠি দিয়ে জানাননি। এমনি কেন যেন মনে হল—

রুবির চোখ নিমেষের তরে যেন জ্বলে উঠল। সে লতিকার কাছে শুনেছিল মেজ বৌ'র নাকি ওদিক দিয়ে একটা গোপন দুর্বলতা আছে।'

লেখক নজরুল ও নাসরিন বিবির সম্পর্কে বা দুর্বলতার কথা এর চেয়ে খুলে আর কি বলবেন ?

কিন্তু রুবি কে ? ফজিলাতুন্নেসা ?

একথা মনে আসার কারণ হচ্ছে নজরুল ১৯২৮ সালে একটানা আড়াই মাস ঢাকায় থাকার সময় ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে পরিচিত হন, ঘনিষ্ঠতা জন্মায় এবং তিনি ফজিলাতুন্নেসার প্রেমে পড়েন। বিদুষী মহিলা ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে নজরুলের প্রেম সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। আকবরউদ্দীন সাহেব-এর মত হচ্ছে, 'আজীবন দুঃখ তাড়িত নজরুল ফজিলাতুনের মধ্যে তাঁর মানসী প্রিয়ার দেখা পেয়েছিলেন।' তাঁর মতে, 'ফজিলাতুনের প্রতি নজরুলের আগ্রহ ছিল স্বাপ্নিক। পক্ষান্তরে ফজিলাতুনের আগ্রহ ছিল, নজরুলের মুখে শোনা এক রাতের ঘটনা অনুযায়ী, জৈবিক।'[৮৫]

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনাকালেই ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে নজরুলের এই পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। ফজিলাতুন্নেসা অতি বিদুষী, বাঙালী মুসলমান সমাজে তখন অতি বিশিষ্টা। তাই উপন্যাসে তাঁকে আনতে গিয়ে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হামিদ সাহেবের কন্যা করতে হয়েছে। তার স্বামী আই. সি. এস. পড়তে বিলাত যাবে বলে ঠিক হয়েছিল। বিলাত যাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল ইসলাম' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ফজিলাতুন্নেসা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। তিনি বোরখা পরতেন না, ঢাকা শহরের রক্ষণশীল পরিবেশের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়াশোনা করতেন। হিন্দু মুসলমান অনেককেই তিনি তাঁর

বাসায় আসতে দিতেন, অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করার সুযোগও দিতেন। ফজিলাতুন্নেসা ঢাকায় থাকতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নলিনীমোহন বোসের তত্ত্বাবধানে।

এই পরিচয়গুলোর বা বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে বলতে ইচ্ছে করে কেন রুবি হিন্দু বিধবার বেশভূষা ব্যবহার করে এবং সেই মতো বিধবার আচার বিচার কঠোরভাবে মেনে চলে। অবশ্য এটা না করলে রুবির প্রেমও বুঝি ফুটত না।

ফজিলাতুন্নেসার আগ্রহ ছিল জৈবিক। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায়? ওয়ালটেয়ারে রোগশয্যায় শায়িত আনসারের কাছে রুবি ছুটে গেল। তারপর? লতিকাকে চিঠি লিখে রুবি জানাচ্ছে: 'দুদিন না যেতেই বুঝলাম ক্ষুধিত অজগর জেগে উঠেছে। ওর সে বিপুল আকর্ষণ এড়িয়ে থাকার সাধ্য কি বন হরিণীর? সে আমায় তিলে তিলে গ্রাস করতে লাগল।...আমি জানতাম এ রোগের বড় শত্রু প্রবৃত্তি।...আমি আমার উপবাসী ভিখারী বন্ধুকে ফেরাতে পারলাম না।...আমি পরিপূর্ণ রূপে তার ক্ষুধিত মুখে আত্মসমর্পণ করলাম।'[৮৭]

একটি নারী এভাবে ছাড়া আর নিজের কথা কিভাবে প্রকাশ করবে? এইসব বিচারেই মনে হয় ফজিলাতুন্নেসা বা নজরুলের মানসী প্রিয়া এখানে রুবি চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু আনসার চরিত্র ও তার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ যথাযথভাবে বিকাশিত হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে নজরুল ইসলামের তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা—এই দুই-এর প্রকাশ ঘটেছে আনসার-কাহিনীতে। ব্যক্তিজীবন যুক্ত বলেই লেখক এখানে ভাবাবেগ চালিত।

চৌদ্দ

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস দুটি কাহিনীকে ধারণ করে আছে। একটি চাঁদসড়ক পল্লীবাসীর কাহিনী। অন্যটি আনসার-রুবির কাহিনী। চাঁদসড়ক পল্লীর মানুষের জীবন ঘিরে আছে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটন,

অশিক্ষা সামাজিক অন্যায় অবিচার। সেই সঙ্গে মুসলমান খৃস্টানের দ্বন্দ্ব।

দ্বিতীয় কাহিনীতে আছে দেশের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার কথা, জাতির সার্বিক মঙ্গলের চিন্তা, নিপীড়িত মানুষের জন্য উত্তরণের পথ সন্ধানের কথা। সেখানে ধর্মীয় সংঘাতের কথা নেই। আছে উদার মানবিক চিন্তা চেতনার কথা। অসহায় মানুষ জনকে সংগঠিত করে, তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস শক্তি গড়ে তোলার কথা। কিন্তু সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাহিনী দুটি মিলিত হয়ে—মিলিত নদীধারা যেমন একটি প্রবল ধারা হয়ে সমুদ্রগামী হয়, তেমন হতে পারেনি। অথচ যৌগিক কাহিনী পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অখণ্ডতা লাভ করাই উচিত। নাহলে রচনা সার্থকতা লাভ করে না, রস সৃষ্টি ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস প্রসঙ্গে ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেন: 'মৃত্যুক্ষুধা···উপন্যাসের জন্যে নজরুল সৎ ঔপন্যাসিকের গৌরব সঙ্গত ভাবেই কতকটা দাবী করতে পারেন। এই একটি গ্রন্থই সত্যকার উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। এই উপন্যাসেই নজরুল জনসাধারণের আশাআকাঙ্ক্ষা, বেদনা ও নৈরাশ্যকে সার্থক শিল্পীর মত স্পর্শ করতে পেরেছেন।'[৮৮]

এই সার্থকতার মূল্যও কম নয়, বিশেষত কৃষ্ণনগর ও নজরুল ইসলাম আলোচনার ক্ষেত্রে।

মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে চাঁদসড়ক পল্লীর কাহিনীতে গুরুত্ব পেয়েছে মুসলমান পল্লীর মানুষের খৃস্টধর্ম গ্রহণ। মুসলমান পরিবারের বধূ মেজ বউকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে নিলেন মিশনারিরা। প্যাঁকালে খৃস্টান পরিবারের মেয়ে কুর্শির প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করতে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করল। আর তা নিয়ে মুসলমান পল্লী শংকিত, উত্তেজিত, আলোড়িত। উপন্যাসে এই বিষয়টি বিশদভাবে বর্ণিত। কৃষ্ণনগরের ইতিহাসে খৃস্টীয় ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গ নতুন নয়। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে এই প্রসঙ্গ একটি সংযোজন মাত্র।

যেহেতু উপন্যাসের পটভূমি কৃষ্ণনগর এবং নদীয়া জেলা, তাই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে বলে মনে হয়। তাতে উপন্যাসটি

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হতে পারে।

কৃষ্ণনগরে চার্চ মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক সি. এম. এস. স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৩৪ সালে। এই বিদ্যালয়ে পাদরী সাহেবরা ছাত্রদের কাছে খৃস্টধর্ম প্রচার করতেন। ছাত্রদের প্রভাবিত করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। একবার কৃষ্ণনগরের সন্নিকটস্থ গ্রাম ভাতজাংলার চিন্তামণি সরকার নামের এক ব্রাহ্মণ বালককে তার অভিভাবকদের অজ্ঞাতে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করে নিলেন পাদরীরা। শহরবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালেন। স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট হলো। স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে পাদরীরা দোষী সাব্যস্ত করলেন এই বলে যে তিনি ছাত্রদের প্ররোচিত করে ধর্মঘট করিয়েছেন। তিনি চাকরী ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি শহরে নতুন একটি স্কুল স্থাপন করলেন। তার নাম কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল।

প্রমথ চৌধুরী অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের বীরবল, তাঁর বাল্য এবং কৈশোর জীবন কেটেছে কৃষ্ণনগরে। বাল্যকালে তিনি কিছুকাল ওই সি. এম. এস. স্কুলে পড়েছিলেন। সেটা ১৮৭০ সাল নাগাদ হবে। তিনি তাঁর আত্মকথায় সি. এম. এস. স্কুল সম্পর্কে একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন।

'বোধহয় প্রতি হপ্তায় একজন পাদরি এসে আমাদের খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে বাঙলায় বক্তৃতা দিতেন। মাসখানেক পরে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কি শিখেছি। আমি ও সেজদা আদম ও ঈভের নাম করতেই তিনি মহা চটে বললেন, ওসব গাঁজাখুরি গল্প তোমাদের শিখতে হবে না। আর কি শিখেছ? আমরা বল্লুম—পাদরি সাহেবের কাছে একটি ভজন শিখেছি। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, কি ভজন? আমরা দু ভাই মিলে ভজনটি গাইলুম—

বন্নে এলো ভেসে গেল, চাষার ডুবলো ধান
শালাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি শাস্তি দিলেন ভগবান।

এ ভজন শুনে বাবা চোখ রাঙিয়ে বললেন, তোমাদের আর স্কুলে যেতে হবে না। আর মাকে সম্বোধন করেও বললেন, কি কর্ম্ম?

মা বললেন, চাষাদের কু কর্ম্ম এই যে তারা খৃস্টান হয়নি। এর পরই আমরা সে স্কুল ত্যাগ করলুম।'[৮৯]

এই খৃস্টধর্ম প্রচার এবং কাউকে দীক্ষিত করার সঙ্গে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের মিশনারিদের ভূমিকার মিল নেই। ক্ষেত্রও ভিন্ন। স্কুলে শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করা হতো। মেজ বউ-এর ক্ষেত্রে মিশনারিদের ভূমিকা ভিন্ন প্রকার। এখানে ব্যক্তি ও পরিবারের দারিদ্র্য অসহায়তা, সেই সঙ্গে নিজ সমাজের ঔদাসীন্য অবহেলা এমন কি অবিচার অত্যাচার—তার পাশে মিশনারিদের সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতির ভিতর দিয়ে পরিত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ এবং সেই পথে ধর্মান্তরিত করব।

নদীয়া জেলায় এই ভূমিকা নিয়েই মিশনারিরা ধর্মান্তরিত করেছেন শত শত পরিবারকে। নদীয়া জেলায় ১৮৭১ সালে প্রবল বন্যা হয়, পরের বছর খরা। ফলে গ্রামাঞ্চলে যেমন দুর্ভিক্ষ নামে, তেমন শুরু হয় মহামারী। গ্রামের পর গ্রামের মানুষ উজাড় হয়েছিল এতে। এই দুঃসময়ে মিশনারিরা বিপন্ন অঞ্চলে সেবাকর্মে ব্রতী হয়েছিলেন। অন্ন দিয়েছিলেন, ওষুধ দিয়েছিলেন, দুর্গতদের নতুন করে বাঁচতে সাহায্য করেছিলেন। ফলে অসহায় মানুষেরা পাদরীদের কাছে আত্মসমর্পণ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেই উনিশ শতক থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্যন্ত আরও অনেকবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে জেলার গ্রামসমূহে আকাল নেমেছিল। তখনও মানুষ এভাবেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তা নিয়ে সমাজে বিশেষত মুসলমান সমাজে আলোড়ন জেগেছিল খুব। মুনসী মনিরুদ্দিন আহমদ লিখিত 'আখে লাখে জামিরিয়া ও রদ্দেনা ছারা' গ্রন্থে পদ্য আছে :

নদীয়া জেলায় আজি বেরাদার গণ।
যত কেরেস্তান লোগ সব কর দরশন॥
বাপ দাদা তাহাদের আকালের বারে।
পেটের দায়েতে মজে যীশুর মন্তরে॥

দেল জ্ঞান হইতে তারা যীশু না ভজিল।
আপলোকে আখের সবে পরাণ তেজিল ॥[২০]

আঞ্জমানে এত্তেফাক এসলামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

'আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন, মেহেরপুর ও কৃষ্ণনগর সদর মহকুমার এলাকায় আট হাজারের অধিক খৃস্টান অধিবাসীর বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান বংশোদ্ভব। তাহারা গত ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয় লয়। পাদরীরা সেই সুযোগে তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করে। যদি মুসলমান সমাজে অর্থ থাকিত বা শিক্ষিত হইয়া ইসলামের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিত, তাহা হইলে প্রাণ গেলেও পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয়ে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইত না।'[২১]

এটা হচ্ছে আঞ্জমানে এত্তেফাক এসলাম নদীয়ার ৬ষ্ঠ বার্ষিক (১৩১৭) রিপোর্ট। কুমারখালী, নদীয়া, ১৯১২, পৃঃ ১-২

এই হচ্ছে ধর্মান্তরকরণের সংবাদ এই জেলার।

মুসলমান সমাজ নীরব হয়ে দমে থাকেনি। ক্রমে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। নদীয়া জেলায় মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণ কর্মের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলেন মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩৭)। অখণ্ড নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার গাঁড়া ডোব গ্রামে ১৯৭০ সালে মুনশী শেখ জমিরুদ্দিনের জন্ম। প্রথম জীবনে তিনি খৃস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। চাপড়ার গির্জায় তিনি বাপ্টাইজড হন। তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা করেন। মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ধর্মান্তরিত হন ১৮৮৭ সালে। তিনি কলকাতার সি. এম. এস. স্কুলে কিছুকাল পড়েন। তারপর ১৮৯১ সালে এলাহাবাদের সেণ্ট পলস্ ডিভিনিটি কলেজে পড়তে যান। সেখান থেকে ব্যাচেলার অব থিয়োলজি পাশ করেন প্রথম বিভাগে। তারপর হায়ার গ্রেড রীডার হন। এরপর তিনি কলকাতার সি. এম. এস. ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজেও পড়েছেন। বাংলা ইংরাজী আরবী ফার্সি সংস্কৃত উর্দু ইত্যাদি ভাষা শিখেছিলেন। তিনি

খৃস্টধর্ম প্রচারক হন। প্রথম প্রচার কাজ করেছিলেন ১৮৯০ সালে কৃষ্ণনগরের কুত ঘাটে। এরপর তিনি অনেকদিন নদীয়ায় খৃস্টধর্ম প্রচারকের কাজ করেন। অনেক হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তারপর নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে তাঁর মনে খৃস্ট ধর্মের প্রতি বিশ্বাস শিথিল হতে থাকে। শেষে ঠিক করেন যে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করবেন। এজন্য তিনি কলকাতায় গিয়ে রাজা রামমোহন রায় ও কেশবচন্দ্র সেনের রচনাদি পাঠ করতে থাকেন এবং ব্রাহ্ম মত তাঁর ভালো লাগে। কিন্তু কলকাতার এলবার্ট হলে ব্রাহ্ম সমাজের নগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর বক্তৃতায় মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ (সঃ) সম্পর্কে খৃস্টান সমাজের বিষোদগার ও অভিযোগ খণ্ডন করে তাঁকে ঈশ্বরে সমর্পিত একজন প্রকৃত মহামানব ও সত্যধর্ম প্রবর্তক বলে অভিহিত করেন। এই আলোচনা শুনে মুনশী জমিরুদ্দিনের চিন্তার পরিবর্তন ঘটল। তিনি এবার মুসলমান পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকলেন। তিনি খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। ক্রমে তিনি মুসলমান ধর্মের প্রচারক হলেন। এইবার তিনি খৃস্টান মিশনারি বা পাদরীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন। বাকী জীবনব্যাপী তিনি এই কর্মে ব্রতী ছিলেন।

'ইসলাম ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত হওয়ার পর জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লাহর একান্ত সহচর হিসাবে ইসলাম প্রচারকের কাজ করেন। ১৯০৭ সালে মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ বছর এককভাবে ইসলাম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। প্রধানত বিধর্মীদের ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট এবং স্বধর্মীদের ধর্মান্তর প্রতিরোধে খ্রীস্টান মিশনারীদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২) বলেছেন : 'জনাব মুনশী সাহেবের নিকটেই শুনিয়াছি এই পুস্তক প্রকাশের (১৯৩৪) কিছুকাল পূর্ব্ব পর্যন্ত তাঁহার নিকট ১৩০৪২ জন খৃস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে......।'[৯২]

এই গ্রন্থ থেকেই জানা যাচ্ছে যে তিনি ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রচার কাজে রত ছিলেন। নদীয়া জেলার ব্রাহ্ম সমাজকে সংগঠিত করার কাজ করেছেন এবং পাদরীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, মুনশী জমিরুদ্দিন ১৩০৪ সালে রানাঘাটের প্রসিদ্ধ পাদরী মনরো সাহেবের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। পাদরী মনরো অবশ্য তর্কযুদ্ধে যোগ দেননি।

আবার দেখা যাচ্ছে: ১৩৩১ সালে (৭ই আগস্ট ১৯২৪) মেহেরপুরের ভবের পাড়ায় মুনশী জমিরুদ্দিন ধর্মসভা করছেন। সভাপতি মেহেরপুরের উকীল মহম্মদ মোহসেন। ইনি পরবর্তীকালে এম. এল. এ. হয়েছিলেন ইংরাজ আমলে। মুনশী জমিরুদ্দিন রোমান ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীদ্বয় সাক্কী ও কুরুণী বিরচিত একটি গ্রন্থের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করছেন।

আর মুনশী জমিরুদ্দিনের এই প্রচার অভিযান কতোদূর সফল হয়েছে তাও জানা যাচ্ছে: '...মুনশী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের লেখনীপ্রসূত রদ্দে নাছারা প্রভৃতি ও অন্যান্য লেখকের কতিপয় পুস্তক প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন খৃস্টান সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইতেছে। নূতনভাবে আর কেহই এই ধর্মের প্রলোভনে পতিত হইতেছে না, বরং যীশু ভক্তগণই মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে; এই আনন্দদায়ক সংবাদই আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে।'[৯৩] এই আঞ্জমনের একটি প্রতিবেদন।

রাজনৈতিক মতাদর্শে মুনশীজী ছিলেন রাজভক্ত। এ বিষয়ে তিনি সক্রিয় ভূমিকাই পালন করেছেন বরাবর। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের বিরোধিতা করে মুসলমান সমাজে রাজানুগত্য বিষয়ে প্রচার করার জন্য রাজশাহীর কমিশনার তাঁকে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। কংগ্রেসী স্বদেশী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার চালিয়েছেন নিরন্তর। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনী গ্রন্থে লেখা হয়েছে:

'জাতীয় জীবনের ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারার সঙ্গে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠ অংশের যে বিচ্ছিন্নতা জন্মেছিল জমিরুদ্দীন ছিলেন সেই ধারার পথিক।'[৯৪]

এই তথ্যসমূহ থেকে অনুমান করা যায় নদীয়া জেলার মুসলমান সমাজে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের প্রচার কতো ব্যাপক ছিল। খ্রীস্টীয় মিশনারীদের সম্পর্কে কোন মনোভাব পোষণ করছিল এই সমাজ। বস্তুত রীতিমত একটা সংঘাত ও বিরোধ চলছিল। মুসলিম মৌলবাদী শক্তি সুসংগঠিত হয়ে উঠেছে। দেখা যাচ্ছে, চাঁদ সড়কে নজরুলের নিকট প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠজন এস. এম. আকবরউদ্দীন ১৯২৭ সালে আনজুমানে ইসলামিয়ার কৃষ্ণনগর শাখার সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন। আর এই ১৯২৭ সালেই নজরুল ইসলাম 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনা শুরু করছেন। এই পরিবেশ পরিস্থিতি ও পরিস্থিতির কথা ভাবলে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেকটা বেড়ে যায়।

কাজী নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার ইচ্ছা কেমন করে জেগেছিল সেকথা আগেই জানানো হয়েছে।

নজরুল ছিলেন সর্বপ্রকার মৌলবাদবিরোধী মানবতাবাদী। তাঁর প্রতি মৌলবাদী শক্তি বিরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। নদীয়ার সংগঠিক ওই মৌলবাদী শক্তি তাঁকে হেয় করতে চাইবেই। সেই স্বাভাবিক কারণেই এক গ্রাম্য মৌলবী তাঁকে কুৎসাপূর্ণ চিঠি দিয়েছিলেন।

চিঠিতে তাঁকে কাফের ইত্যাদি অনেক কিছুই বলা হয়েছিল। সেটা শুনতে তিনি অভ্যস্তও ছিলেন। কিন্তু সেই চিঠিতে তাঁর স্ত্রীকেও আক্রমণ করা হয়েছিল। তিনি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না করেই এটাই ছিল তাঁর অপরাধ। এস. এম. আকবরউদ্দীন তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন যে, নজরুল মর্মাহত হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীকে আক্রমণ করায়। আকবরউদ্দীন সাহেব কবিকে সান্ত্বনা দিতে, কবির বাসার সামনে কলতলায় মহিলাদের ঝগড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ ওই ঝগড়া যেমন অর্থহীন, গুরুত্বহীন এই চিঠিও তেমনি গুরুত্বহীন মূল্যহীন।

কবির মনে ধরেছিল কথাটা। কারণ কলতলার ঝগড়া তিনি প্রত্যহই শুনতেন এবং তা যে কতো অসার তাও বুঝতেন।

এই চিন্তা থেকেই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার ইচ্ছা জাগে। অর্থাৎ মৌলবী সাহেবের চিঠি যেন প্রশ্ন এবং কলতলার ঝগড়া তার উত্তর। ধর্ম ও ধর্মান্তরকরণ যাবতীয় সমস্যার মীমাংসা যেন ওই কলতলার ঝগড়া। সব মিলিয়ে বলা যায়. 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' গানের মতোই 'মৃত্যুক্ষুধা' একটি প্রতিবাদী উপন্যাস। বিদ্রোহী কবির মোলবাদ বিরোধী উদার মানবিক দৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত এই কাহিনী।

চাঁদ সড়ক পল্লীর বাসিন্দা মুসলমান এবং ওমান কাতলি খৃস্টান সম্পর্কে কাহিনীর সূচনাতেই বলে দেওয়া হয়েছে যে হয়তো ওরা আগে একই জাত ছিল। তা থেকে একদল হয়েছে মুসলমান আরেক দল খৃস্টান। অর্থাৎ উভয়েই ধর্মান্তরিত। তারাই এখন জাত্যাভিমান নিয়ে মত্ত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতের বড়াই করে। ওদের জীবিকা, জীবনযাপন ধারা, ওদের দারিদ্র্য অসহায়তা একই রকম। তবু ওরা এ ওকে নিচু ভাবে। আর কলতলায় মহিলা মহলের ঝগড়ায় ওই জাতপাতের কথাই বড় হয়ে ওঠে। মুসলমান মেয়ের জলের কলসী খৃস্টান মেয়ে ছুঁয়ে দিয়েছে, তাই নিয়ে ঝগড়া। মুসলমান পক্ষে গজালের মা বলছে, 'হারামখোর খেরেস্তান কোথাকার। হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শূয়োরের মত চর্ব্বি হয়েছে, না লা?'

এর উত্তরে হিড়িম্বা বলছে, 'তা বলবি বই কি শুঁটকি! ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ীর হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেকনাই বেড়েছে কি না!' গজালের মার জবাব হচ্ছে, '···ওলো আমার ছেলে খেরেস্তানের ভাত রাঁধে নাই লো, আমার ছেলে জজ সায়েবের খানসামা ছিল—জজ সায়েবের লো, ইংরেজের।'

এই চাপান উতোর অতি শ্লেষাত্মক। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষের জাত্যাভিমানের কী করুণ প্রকাশ।

কিন্তু ঝগড়ার পরিণতি কি? ওই তুলকালাম ঝগড়ার মধ্যে একটা গয়লাদের ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে পচারে—উই শালা পচা···তোর

দিদিমা মা কালী হয়ে গিয়েছে।'

ব্যস, সেই প্রচণ্ড ঝগড়ার বেলুন ফেঁসে গেল। একটা মুসলমান বউ হেসে বলে উঠল, 'হাতে একটা খাঁড়া দিলেই হয়।'

আরেকটি মেয়ে বলে উঠল, 'কাপড়টাও খুলে পড়তে আর বাকী নেই।'

অমন ঝগড়ার এই পরিণতি। লেখকের মন্তব্য, 'ঝগড়া হতেও যতক্ষণ, ভুলতেও ততক্ষণ।'

অর্থাৎ এটা ওদের জীবন নয়, জীবনের বহিরঙ্গ।

লেখকের এই দৃষ্টিই ছড়িয়ে পড়েছে কাহিনীতে।

জীবনকে তলায় ফেলে বহিরঙ্গের রূপ কেমন করে আচ্ছন্ন করে আছে সেটাই দেখান হয়েছে।

প্যাঁকালেদের পরিবার অতি দরিদ্র। প্যাঁকালের বোন পাঁচি প্রসব বেদনায় কাতর। পয়সা নেই যে টাকা দিয়ে দাই নিয়ে আসবে। পাড়ার লোক উঁকি দিয়েও দেখে না। শেষে কলতলায় গজালের মা যাকে হারামখোর খৃস্টান বলেছিল, সেই হিড়িম্বাই ছুটে এসে উদ্ধার করে পাঁচিকে। আর পাড়ার মানুষ দারোগা সায়েবের বাড়িতে দুধ বিড়ালে খেয়ে ফেললে, যেটুকু পড়ে ছিল, সেটা তো তারা খেতে পারে না—তাই একেবারে ফেলে না দিয়ে আধপোয়া দুধে জল ঢেলে আধ সের করে দারোগা গিন্নি পাঠিয়ে দেয় প্যাঁকালেদের বাড়ি। ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েরা সেই দুধের ক্ষীর পায়েস খেয়ে ধন্য হয়।

মেজ বউ আর তার ছেলেকে দেখতে যেদিন পাদরী সায়েব আর সিস্টার মিস্ জোন্স এলো, ওষুধ দিল, গজালের মা কৃতার্থ হয়ে বলল, 'খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব।' তারপর বলল,…'যদি ভালো করতে পার, কেনা গোলাম হয়ে থাকব তাহলে।'

মেম সায়েব যাবার সময় একটা টাকা দিয়ে গিয়েছে, মেজ বউ-এর পথ্যি কিনতে। বলেছে বেদানার রস খাওয়াতে।

পাদরীরা চলে গেলে মেজ বউ কাঁদতে লাগল এই বলে 'কপালে এত দুঃখুও লিখেছিলে আল্লা। মেজ বোর যাবার সময়ও ঘরের পয়সার

ছুটো আঙুর কি একটা বেদানা কিনে দিতে পারলুম না। শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে।' এরপর মেজ বউ ক্ষোভে দুঃখে বলে উঠেছে, 'ঝেঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুমের মুখে। সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়?' একথা শুনে তার শাশুড়ীও কেঁদে বলে, 'যা বলেছিস মা।'

মৌলবাদী শক্তির কাছে লেখকের এ যেন চ্যালেঞ্জ। মেজ বউ-এর এই উক্তি যেন নিপীড়িত মানুষের মর্মভেদী আর্তনাদ। তার কাছে জাতি ধর্ম আত্মীয় কুটম্ব কেউ সত্য নয়, সত্য সেই যে দু'হাত বাড়িয়ে দেবে পরিত্রাতার ভূমিকায়।

এই পথেই মিশনারীরা ধর্মান্তরিত করেছেন হিন্দু মুসলমানকে। আর্ত মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে ওঁদের কাছে। কারণ নিজের জাত গেঁয়াত ধর্মের মানুষ কেউ তাদের রক্ষাকর্তা রূপে এগিয়ে আসেনি।

ঘটনাচক্রে মেজ বউকেও খৃস্ট ধর্ম নিতে হলো। সে নিজের জাত ধর্ম সম্পর্কে সজাগই ছিল। প্রথম দিন মিস জোন্স তাকে চা খেতে বললে সে খায়নি। বলেছিল, 'মিস বাবা, আমাদের জাত যায় তোমাদের সাথে খেলে।' মিস জোন্স বলল, 'কিন্তু তোমাদের মুসলমান ধর্মের অনেক কিছু জানি, টাটে কারুর সঙ্গে খেটে টো নিষেধ নেই।'

মেজ বউ হেসে বলল, 'তা ত আমি জানি না, আমাদের মৌলবী সায়েব আর মোড়ল ত অনেক জরিমানা করেছে খেরেস্তানেদের ছোঁওয়া খাওয়ার জন্য।'

এরপর মিস জোন্স মেজ বউ-এর ছেলেমেয়েকে চা বিস্কুট খাওয়াল। তারপর মেজ বউকে পাশে বসিয়ে বলল, 'তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি, আমি তোমাকে আপন বোনের মতো করে লেখাপড়া শেখাব।'

সত্যিই মেজ বউ একদিন খৃস্টান হয়ে গেল। তা নিয়ে গজালের মা চেঁচিয়ে কেঁদে পাড়া মাতিয়ে তুলল। আর মেমসায়েবের নামে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে লাগল। পাড়ার পুরুষ মেয়ে সবাই বলতে লাগল, 'এইবার মাগীরা মেজ বৌকে আড়কাঠি করে সব বউ ঝিকে খেরেস্তান করে তুলবে।'

আর 'পাড়ার মসজিদের মোল্লা সায়েব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ী মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বে-ইমান নাসাবাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন।···মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হ'ল যে, কালই মওলানা হজরত পীর গজনফর সায়েব ও মওলানা রুহানী সায়েবকে এই গোমরাহ বেদীনদার নসিহত ও দরকার হলে বহস করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবেন পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ীর ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনের টাকা জোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে 'পতিত' থাকবে।'[৯৫]

এই বিবরণ পাঠে মনে পড়ে সেই মৌলবীকে যিনি নজরুলকে গাল-মন্দ করে চিঠি দিয়েছিলেন। এ যেন সেই চিঠিরই জবাব।

এই সভায় বিপ্লবী আনসারও উপস্থিত হয়েছিল ব্যাপার জানতে। সভা থেকে ফিরে এসে লতিকা বলল, কি হলো? আনসার বলল, ঘোড়ার ডিম। সেই মৌলবী সম্পর্কে নজরুলের এটাই মন্তব্য বলে ধারণা হয়।

আনসার পরদিন গির্জায় গেল জানতে যে মেজ বউ স্বেচ্ছায় খৃস্টান হয়েছে না তাকে প্রলোভন দেখিয়ে খৃস্টান করা হয়েছে? সে দেখা করল মেজ বউ-এর সঙ্গে এবং জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা বলুনতো আপনার হঠাৎ খৃস্টান হবার কারণ কি?'

মেজ বৌ···বললে, 'আমি ত হঠাৎ খৃস্টান হইনি।'

আনসার···বললে, 'তার মানে আপনি একটু একটু করে খৃস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান, বুঝি?'

মেজ বৌ···বললে, 'জী না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খৃস্টান করেছেন।'

আনসার···তারপর সহানুভূতিমাখা কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝেছি, আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কতো বেশি অত্যাচার করে আপনার মত মেয়েকেও খৃস্টান হতে বাধ্য করেছে।'[৯৬]

এরপর আনসারের আর কি বলার আছে? সে মিস জোন্সকে

বলল, 'আমি আমার হৃদয়হীন সমাজে এই ফুলের প্রাণকে নিয়ে গিয়ে শুকিয়ে মারতে চাইনে। আমার শুধু একটি অনুরোধ, একে আপনারা মানুষ করে তুলবেন, তাহলে এর দ্বারা বহু মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে'।[২৭]

চাঁদ সড়ক পল্লীতে আনসারের এই ঘোষণা, মুনশী সেখ জমিরুদ্দীনের পাদরী বিরোধী আন্দোলনের স্পষ্ট প্রতিবাদ ছাড়া আর কি ?

কিন্তু শেষ অবধি প্যাঁকালে, মেজ বউ আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে এলো, সমাজের উন্নতি বা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বলে নয়। সমাজ সেই পূর্ববৎই আছে। আনসারের ভাষায় ধর্মান্ধ, হৃদয়হীন। তবু তারা ফিরে এলো। এই ফিরে আসা সম্পর্কে লেখকের বিবরণ লক্ষণীয়।

'প্যাঁকালে ফিরে এসেছে। আগে এখানে সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো। তার দিকে কেউ ফিরেও তাকাত না। শিক্ষিত খানদানী কোন মুসলমানের কাছে তার পাত্তাও ছিল না। তারপর সে খৃস্টান হয়ে গেল। বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেটের পিয়ন হয়েছিল। সে খৃস্টান। চাঁদ সড়কে আসার পর প্যাঁকালেকে স্থানীয় খান বাহাদুর সায়েব একটা কুড়ি টাকার চাকরী জুটিয়ে দেওয়াতে সে আবার কলমা পরে মুসলমান হয়ে গেছে।'

আর কুর্শির বাবা মধু ঘরামী মারা গিয়েছে। স্বামী আবার মুসলমান হয়ে গেল। সে একা কিভাবে থাকবে ? তার বাবা মুসলমান ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অতএব নিরুপায় কুর্শিও মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে প্যাকালের ঘরে চলে এলো।

আর মেজ বউ ? তার ছেলে মারা গিয়েছে। সে শোকগ্রস্ত। কিন্তু বাইরে তার শোকের প্রকাশ নেই। মিশনারীরা তাকে অনুরোধ করেছিল, তাদের কাছে থাকতে, সে থাকেনি। সে তার শ্বশুর বাড়ির ঘরেই থাকে। কিন্তু মুসলমানও হয়নি। এর ওর বাড়ি যায় ধোব-দোরস্ত হয়ে। ফলে লোকে অনিচ্ছা সত্বেও চৌকি এগিয়ে বসতে দেয়। আর তারা ভাবে, 'মেজ বউ এই এক বছরে না জানি বহু সায়েব কাপ্তেন

পাকড়ে টাকার কুমীর হয়ে এসেছে। দুঃখ ধান্দা করে খায়। কাজেই আগে থেকে একটু মুখের ভাবটা থাকলেও হয়ত বা কালে কবুলে হাত পাতলে কোন না দুটো টাকা পাওয়া যাবে।'

পাড়ার মোড়লের চিন্তা ভিন্ন।

'অনেক চিন্তার পর সে স্থির করলে সে পাড়ার কোন মুসলমান ছোকরাকে দিয়ে ওর রসস্থ মন ভুলাতে পারলে ওকে অনায়াসেই স্বধর্মে ফিরিয়ে এনে একজন নাসারাকে মুসলিম করার গৌরব ও পুণ্যের অধিকারী হতে পারবে। কাজেই সে মৌলবী সায়েবের সঙ্গে পরামর্শ করে আর বেশি পীড়াপীড়ি করলে না এ নিয়ে।···কেউ কিছু বললে মোড়ল হেসে বলে, বাবা এখন দিগদড়ি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। যাবে কোথায়? একটু চরে খাক, তারপর ঘরের গাই ঘরে ফিরে আসবে।'[১৮]

এরপর মেজ বউ একদিন আবার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করল। কিন্তু কেমন পরিস্থিতিতে? ছেলের মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্ণ হলো। সে খৃস্টান। ছেলেও মুসলমানই ছিল। কাজেই সেদিন চালশে। মেজ বউ ঠিক করল সেদিন সে পাড়ার শিশুদের খাওয়াবে, নিজে হাতে রান্না করে।

কিন্তু বড় বউ বলল, পাড়ার মোড়লকে, মৌলবীকে বলতে হবে। নাহলে খৃস্টানের হাতে তো কোন ছেলে খাবে না।

মেজ বউ অগত্যা মোড়লের কাছে গেল।

'মোড়ল দেখলে, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুযোগ। এ সুযোগ ছাড়লে ওকে আর ঘরে ফেরান যাবে না। সে খুব ভালো মানুষ সেজে বললে, তা কি করব বল মা, তুই ত আমার মেয়ের মতই। খৃস্টানের হাতে, আমি বললেও কেউ খাবে না—মরে গেলেও না।

মেজ বৌ-র দগ্ধ চোখে সহসা যেন অশ্রুর পুঞ্জীভূত মেঘ ঘনিয়ে এল। মনে পড়ল, কতদিন অনাহারে কাটিয়ে তার খোকা চলে গেছে। তার সমস্ত মন যেন হাহাকার করে আর্তনাদ করে উঠল। সে আর নিজেকে সম্বরণ করতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠে সামনের উঠোনে পড়ে বলতে লাগল, আমি মুসলমান হব। আমার খোকার আত্মা যে

চিরকালের ক্ষুধা নিয়ে না ফিরে যায়।'[৯৯]

আর মোড়ল কি করল এ সময়?

'মোড়ল যেন হাতে চাঁদ পেল। সে তখন উঠে মেজ বৌকে তুলে বলল, এই ত মা, এতদিনে মানুষের মত, মায়ের মত কথা বললি। তোর খোকা মরবার সময় পর্যন্ত বিকারের ঘোরে বলেছে, মা তুই খেরেস্তান, তোর হাতে পানি খাব না। তুই মুসলমান হয়ে ওর ফতোয়া না দিলে শান্তি হবে।'[১০০]

এই বিবরণ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ শ্লেষ জর্জরিত। লেখক তুলে ধরেছেন ধর্মান্ধতার স্বরূপ।

এরপর স্বভাবতই মনে পড়ে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীনের মিশনারি বিরোধী এবং ধর্মান্তরিত খৃস্টানদের পুনরায় ইসলাম আশ্রয়ে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনের কথা। চাঁদ সড়ক পল্লীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে তারই সমালোচনা, তারই অন্যায় অবিচার হৃদয়হীনতার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। মিশনারীরা প্রলোভন দেখিয়ে ধর্মান্তরিত করে অভিযোগ তোলা হয়, লেখক আনসারের কাজের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছেন, এই অভিযোগ অসার। অন্যদিকে প্যাঁকালে এবং মেজ বউকে প্রলোভন আর জবরদস্তির ভিতর দিয়ে কীভাবে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করান হলো। মুনশী মনিরুদ্দীনের পদ্যে বলা হয়েছে এরা দেলজান হতে কেউ যীশু ভজেনি। মেজ বউ প্যাঁকালে খুশি—কেউ কি দেলজান হতে মুসলমান হলো? মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন রাজভক্ত দেশের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী। এবং মুসলমান মাত্রকেই ওই ইংরাজ বিরোধী রাজনীতি থেকে সরে থাকতে বলা হচ্ছে। উপন্যাসে তাই যেন আনসারের আবির্ভাব। সে বিপ্লবী। সে ঘোরতর ইংরাজ বিরোধী। তার টুপিতে পিতলের তরবারি ক্রশ আর তার ভিতর হিন্দু মুসলমানের মিলনের প্রতীক একটি ত্রিশূল এবং আনসার বলশেভিক চিন্তায় বা দর্শনে আশ্রিত। অর্থাৎ ধর্ম মানুষের মনে আপিমের মতো কাজ করে। সবার উপরে মানুষ সত্য। সব মিলিয়ে 'মৃত্যুক্ষুধা'কে মনে হয় প্রতিবাদী উপন্যাস।

বাস্তবে দেওর করীমের সঙ্গে নাসরিন বিবির বিয়ে হয়েছিল। নাসরিন ছিল নিঃসন্তান বিধবা। করীম রাজমিস্ত্রীর কাজই করতো। করীম কি নাসরিন কেউই খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাহলে মেজ বউ আর প্যাঁকালে কি নিতান্তই আজগুবি? না, তা নয়। চাঁদ সড়ক বা প্রটেস্টাণ্ট পল্লীকে মুসলমান থেকে খৃস্টান হওয়া অনেক পরিবারকেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তা নিয়ে ওই রকম ধর্মদ্বন্দ্ব কিছু হয় বলে শোনা যায় না। কৃষ্ণনগর সম্পর্কে মীর মোশারফ হোসেন বা প্রমথ চৌধুরী যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন এ শহর আজও সে ভাবেই চলেছে। কয়েক শতাব্দী ধরে এ শহরে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানের বাস, কিন্তু যাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে, এ শহরে তা কখনও ঘটেনি। যদিও বলা হয়ে থাকে এ শহরের হিন্দু, বিশেষত ব্রাহ্মণ সমাজ রক্ষণশীল। কিন্তু এ শহরে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানের মধ্যে সেই ইংরাজ আমলে যে নিবিড় সম্পর্ক, যে মেলামেশা, ভাব ভালোবাসা দেখা যেত এবং এখনও যা দেখা যায় তা যথার্থই এ শহর-সমাজের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ। বারো দোলের, মেলা রথের মেলা আর রোমান ক্যাথলিক গীর্জার সামনে বড়দিনের মেলায় মানুষের যে ঢল নামে, সেখানে কে হিন্দু কে মুসলমান আর কে খৃস্টান তা বোঝা মুস্কিল। কাজেই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের ওই ধর্মান্তরকরণ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যা তা কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক পল্লীতে আরোপিত। তার উৎস কোথায় তা আগেই জানানো হয়েছে, নজরুল মানসে তা কিভাবে আশ্রয় পেয়েছে তাও জানানো হয়েছে। অবশ্যই তা অনুমান। এখন নজরুল নেই, তাঁর সে কাল, এবং সেই চাঁদ সড়ক ও কৃষ্ণনগর নেই। সবই পরিবর্তিত। অর্থাৎ সেকালের অনেক কিছুই আজ নেই। চাঁদ সড়ক আজ আর শহরের একটেরে পড়ে থাকা পল্লী নয়, শহরের মাঝখানে তার অবস্থান। সে কলতলা নেই, সেই বাগান, বাঁশ ঝাড়, ডোবা নেই, সেই জনবিন্যাসও নেই। চাঁদ সড়ক পল্লী এখন অট্টালিকাবহুল। অনেক হিন্দুর বাস। মুসলমান আছে, মসজিদও আছে। আর ওমান কাতালি পাড়ার নাম এখন আর. সি. পাড়া। অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক পাড়া। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উঠে আসা রোমান ক্যাথলিক

সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখানে বসতি করায় আর. সি. পল্লী এখন সুপ্রসারিত। চার্চ ক্যাথিড্রাল দর্শনীয় বস্তু, সে পাড়ায় এখন মিশন পরিচালিত হাসপাতাল, স্কুল, কারখানা, ছাপাখানা,—কতো কি। এতে কৃষ্ণনগর শহরই সমৃদ্ধ হয়েছে। ধর্মান্তরকরণ নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও। বস্তুত ধর্মান্ধতা নেই, কৃষ্ণনগরে যা কোনকালেই ছিল না বলে জানা যায়

নজরুলের কালের জনজীবন, পরিবেশ, পরিস্থিতির আজ অনেক কিছুই নেই। সে সব আজ ইতিহাস কথা। তা আছে মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে। তাই মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাস কৃষ্ণনগরের একটি ইতিহাস গ্রন্থ। এই শহরবাসী তথা বঙ্গবাসীর কাছে এ গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

পনের

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আনসার এককালে চরকায় সুতো কাটায় বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু বোন লতিফাকে বলছে, এখন আর সুতো কাটায় সে বিশ্বাসী নয়। ও পথে দেশকে স্বাধীন করা যাবে না।

কিন্তু লেখক কাজী নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরে থাকার সময় চরকায় সুতো কাটতেন বলে শুনেছি। কৃষ্ণনগর জজ কোর্টের পিছনে অনন্ত-হরি স্মৃতি সদন নামে একটি বাড়ি আছে। সেকালে ওই বাড়িতে কংগ্রেস কার্যালয় ছিল। সেখানে তাঁত ছিল। বস্ত্রবয়ন শিক্ষা কেন্দ্র ছিল ওখানে। শেখাতেন নিতাইচাঁদ বসাক। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল মেহেরপুর। তিনি নিজে বসতি করেছিলেন শান্তিপুরে সাহা পাড়ায়। তিনি আমার পরিচিত ছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছি, নজরুল ইসলাম চরকায় সুতো কাটতেন। চরকা বিগড়ালে ছুটে আসতেন নিতাইচাঁদের কাছে। বলতেন, 'নিতাই চলো, উদ্ধার করো। চরকা চালাই, চরকার গান মিষ্টি, কিন্তু চরকা মেরামত করতে পারিনে। তুমিই ভরসা।'

কৃষ্ণনগরের কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় বহরমপুর কারাগারে নজরুলের কারাসঙ্গী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগরে নজরুলের গ্রেস কটেজ

বাড়িতে যাতায়াত করতেন। বিজয়লালের প্রিয় কবিদের মধ্যে একজন ছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান। কৃষ্ণনগরে সাহিত্য সংস্কৃতির সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেই তিনি হুইটম্যানকে অবশ্যই স্মরণ করতেন। তিনি নজরুল ইসলামকেও হুইটম্যান পড়িয়েছিলেন বা সে সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে এস. এম. আকবরউদ্দীন লিখেছেন :

'আমি জানি 'অগ্রপথিক' কবিতাটি লিখবার আগে পর্যন্ত নজরুল কখনো হুইটম্যানের কবিতা বা কাব্যগ্রন্থ পড়েন নাই। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় একদিন হুইটম্যানের 'Oh! Pioneer' কবিতাটি নজরুলকে দেখিয়েছিলেন। হুইটম্যানের সেই কবিতার অনুসরণে 'অগ্রপথিক' কবিতা রচনা করেছিলেন।'[১০১]

আরেকটি সংবাদও আকবরউদ্দীন সাহেব দিয়েছেন :

'কৃষ্ণনগরে তিন বৎসরেরও বেশী থাকার সময় নজরুল গোড়ার দিকে একবার মাত্র আমার সঙ্গে ঈদের নামাজ পড়তে চাঁদ সড়ক মসজিদে গিয়েছিলেন। আর কখনো তাঁকে নামাজ পড়তে দেখিনি, এমন কি পরবর্তী সময়ের ঈদের জমা-তেও সামিল হননি।'[১০২]

এমনতর সংবাদসমূহ খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

কাজী নজরুল ইসলাম নামাজ পড়তেই পারেন। কিন্তু গ্রেস কটেজে যাবার পরেই আকবরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। তারপর আর গেলেন না কেন? নজরুলের কৃষ্ণনগর জীবন নিয়ে ভাবতে গেলে এ প্রশ্ন মনে আসেই।

যে প্রশ্নগুলো মনে জাগে তা হচ্ছে :

১) হিন্দু পল্লী ছেড়ে অপরিচিত মুসলমান পল্লীতে গিয়েছিলেন বলে? অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে বিশ্বাসভাজন হতে?

২) সোনাপটিতে কালী পুজো করায় মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়েছিল বলে?

৩) ঢাকা বিভাগে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসনে কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রার্থী হয়েছিলেন বলে?

৪) এস. এম. আকবরউদ্দীন সাহেবের অনুরোধে?

একবারের পর আর কোন বার নামাজ পড়তে গেলেন না বা জমায়েতেও গেলেন না বলেই এ প্রশ্ন। পরে আর গেলেন না কেন?

স্বতই মনে হয়, ওই সময় তিনি এমন এক মানসিক সংকটের ভিতর ছিলেন, যার জন্য তিনি সেই বারই মসজিদে গিয়ে ঈদের নামাজ পড়েছিলেন। কী সেই মানসিক সংকটে তিনি বিপন্ন ছিলেন, আজ তার হদিস পাওয়া কঠিন। বার বার ফিরে ফিরে মনে হয় গোলাপটি থেকে চাঁদ সড়কে উঠে আসার মধ্যেই সেই সংকটের কারণ লুকিয়ে আছে এবং তা বেশ জটিল, গুরুতর এবং ব্যক্তিগত—যাতে নজরুলের মতো ব্যক্তি আহত, বিপন্ন। যার সোচ্চার প্রতিবাদ সম্ভব নয়, যা মুখ ফুটে বলা যায় না। অর্থাৎ কবি মনোভঙ্গের বেদনা নিয়ে চাঁদ সড়কের 'গ্রেস কটেজ' বাড়িতে এসেছিলেন, এবং অন্তর্মুখীন হয়ে পড়েছিলেন।

'চাঁদ সড়কে নজরুল' নিবন্ধে আকবরউদ্দীন সাহেব জানিয়েছেন, চাঁদ সড়কে নজরুলের বাসায় কেউ আসত না, যুবকরা ভীড় জমাত না, গানের আসরও বসত না।

এটাই রহস্যময় ব্যাপার। গোলাপটির বাসায় মানুষের ভীড় লেগেই থাকত, মহিলাদেরও ভীড় জমতো। সেই নজরুল চাঁদ সড়কে এলে আর কেউ নেই? প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, (নজরুল সুহৃদ ও নজরুল জীবনীকার) কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ দিতে এসে স্থানীয় যুবকদের ওপর নজরুলের প্রভাব দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। সেই নজরুল এখন যুবকদের কাছে পরিত্যক্ত? রাজনৈতিক মতভেদ? রাজনৈতিক দল তো একটা ছিল না। তাহলে চাঁদ সড়কে উঠে আসার পিছনেই এর কারণ নিহিত বলে মনে হয়। এস. এম. আকবরউদ্দীনের নিবন্ধ মতে, চাঁদ সড়কে নজরুল ইসলাম প্রায় নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর সঙ্গী বলতে একমাত্র আকবরউদ্দীন সাহেব। তাঁর সঙ্গেই সব আলোচনা, পরামর্শ, ওঠাবসা, চলাফেরা।

চাঁদ সড়কে নজরুল ইসলাম নিঃসঙ্গ ভাবে জীবনযাপন করছেন। কেউ তাঁর কাছে আসেন না বলে, তিনিই বা কারও কাছে যান না কেন? এ প্রশ্ন ওঠাও স্বাভাবিক। অর্থাৎ নজরুলও মিশতে চাননা।

কারণটা এমনই।

কলকাতা থেকে বন্ধুরা আসতেন নজরুলের কাছে। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁদের ভিতর একজন। একবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এসে নজরুলকে দেখে অবাক হলেন। আকবরউদ্দীন সাহেবের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করলেন।

'নৃপেন বলল, সে কাজী ত আর নেই—অনেকটা বদলে গিয়েছে। ...ওর ধারণা হয়েছিল, কৃষ্ণনগরে নিঃসঙ্গ থেকে নজরুলের মন মরে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বলল, না, ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতেই হবে।'[১০৩]

নিঃসঙ্গ থাকার ফলে নজরুলের মন মরে যাচ্ছে বলে ধারণা হচ্ছে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের। আকবরউদ্দীনও তা মানছেন। কিন্তু নজরুল কেন বছরের পর বছর এ ভাবে পড়ে আছেন কৃষ্ণনগরে, সে কথা জানাচ্ছেন না কেউ। যদি শহরবাসী তাঁকে পরিত্যাগ করে থাকেন, যদি অভাব অনটনে সংসার অচল হয়ে ওঠে, তাহলে কোন মোহে নজরুল চাঁদ সড়কে আড়াইটা বছর কাটালেন? এর উত্তর মেলেনা।

শেষ অবধি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং নলিনীকান্ত সরকার কৃষ্ণনগরে এসে নজরুলকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে কলকাতায় নিয়ে যান। এ যাওয়াতে নাকি নজরুলের হাত ছিল না। তিনি যেতে চাননি। যেতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে এস. এম. আকবরউদ্দীনের মত হচ্ছে 'সেবার ঢাকা থেকে কৃষ্ণনগর ফেরার পর নজরুলের আচার-আচরণে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং নজরুলের শাশুড়ী গিরিবালা দেবী "সম্ভবত ঢাকা হইতে কাহারো পত্র মারফত ফজিলাতুনের বিষয়টি জানিয়া নজরুলকে আরো নিয়মতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিবার পরিজন সহ" সকলকে কলকাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।'[১০৪]

এটা অবশ্যই ব্যক্তিগত মত। প্রমাণসিদ্ধ নয়।

তবু বলা এই কারণে যে কবি এবং তাঁর স্ত্রী ও শাশুড়ী যাবার কালে এই আকবরউদ্দীন সাহেবের কাছে বিদায় নিয়েছিলেন বলে তিনি জানিয়েছেন। গিরিবালা দেবী বলেছিলেন, কৃষ্ণনগরে থাকলে না খেয়ে

মরতে হবে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন : 'কৃষ্ণনগর থেকে কবি প্রায় ছন্নছাড়া অবস্থায় সপরিবারে কলকাতায় আসেন।'[১০৫]

এ ভাবেই কবি কাজী নজরুলই ইসলামের কৃষ্ণনগর জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

কাজী নজরুল ইসলাম আজ নেই। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করেছিলেন সেই কতো কাল আগে। কিন্তু তিনি একদিন এ শহরে এসেছিলেন। তিনটি বছর এখানে বাস করেছিলেন। সেই স্মৃতি কিন্তু শহরবাসী আজও ভোলেনি। তাঁর কালের মানুষ এখন আর এখানে বেশি নেই। যাঁরা আছেন, তাঁরা আজও তাঁর কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

ষোল

কাজী নজরুল ইসলাম যেমন এসেছিলেন তেমনই আবার একদিন কৃষ্ণনগর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এই কৃষ্ণনগরে আগমন ও অবস্থান যেমন এই শহর, তেমনই নজরুল জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তিনি এসেছিলেন ১৯২৬ সালে। সে সময় বঙ্গদেশের রাজনীতি ও সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্র ছিল দুর্যোগপূর্ণ। রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর নেই। তাঁর মৃত্যুর পর সে শূন্য স্থান তখনো পূর্ণ হয়নি। অর্থাৎ তাঁর মতো সর্ববাদীসম্মত নেতা কেউ নেই। চলেছে নেতৃত্বের লড়াই, দলাদলি, প্রায় মাৎস্যন্যায় দশা। সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে সেই ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এই পরিস্থিতির ভিতরে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন হলো। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো মে মাসে। নজরুল ইসলাম তখন কৃষ্ণনগরে। তাঁর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল সম্মেলনের জন্য উদ্বোধন সঙ্গীত রচনার। তিনি লিখেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গানটি। এই সঙ্গীতে বঙ্গদেশের বিপর্যয়ের অতীত ইতিহাস যেমন স্থান পেয়েছিল, তেমনই

বলা হয়েছিল সমসাময়িক সংকট-কথা। সেই সঙ্গে ছিল কবির আকুল আবেদন, জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি। কাণ্ডারী অর্থে জাতীয় নেতৃবৃন্দ, তাঁদের উদ্দেশ্যে আকুল আবেদনই ছিল কবির হুঁশিয়ারি স্বরূপ। নদীয়া জেলার পলাশীর প্রান্তরে একদিন ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। তার পিছনে ছিল দেশের রক্ষাকর্তাদের দলাদলি, ক্ষমতার লোভ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং অন্তর্ঘাত। কৃষ্ণনগরে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালেও যেন তেমনই এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের কালে কোন শুভ বুদ্ধির হুঁশিয়ারি ছিল বলে জানা যায় না। নদীয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে জাতির সংকট বিষয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তা দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। একজন কবি। তাঁর সে হুঁশিয়ারিতে কেউ কর্ণপাত করেননি সেদিন। তাতে কবির এই ভূমিকার ঐতিহাসিক মূল্য ম্লান হয়ে যায় না।

'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনার পর কৃষ্ণনগরে অবস্থান কালে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'দারিদ্র্য' কবিতা। এর পর আছে অনেক গজল গান ও 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। এই উপন্যাসটিকে 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সঙ্গীতের দ্বিতীয় পর্ব বলা যায়। হয়তো এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, বলা হয়ে থাকে ব্যাসদেব বেদ সংকলনের পর মহাভারত না লিখে পারেননি, এও যেন তেমনই। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার এবং দারিদ্র্য কবিতা রচনার পর 'মৃত্যুক্ষুধা' না লিখে পারেননি। না পারার কারণ দুটো। প্রথম প্রত্যক্ষ কারণ চাঁদ সড়ক পল্লীর বিচিত্র পরিবেশ। দ্বিতীয় কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি। এই বিষয়ে কবির এমন বিশেষ কিছু বক্তব্য ছিল যা বিশদভাবে বলার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আন্তর তাগিদেই তিনি ওই কাহিনী রচনা করেছিলেন। কংগ্রেসের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে হিন্দু মুসলিম প্যাক্ট প্রস্তাব নাকচ হয়েছে। এতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী শক্তি উৎসাহিত। এখানে মুসলিমদের কথাই আলোচ্য। কারণ উপন্যাসে মুসলিম সমাজের কথাই প্রধান। দেশে তখন মুসলিম মৌলবাদী শক্তির প্রকৃত উত্থান ঘটছে।

নদীয়া জেলার মুনশী সেখ জমিরুদ্দীন ও তাঁর অনুগামীদের কথা আগেই কিছু বলা হয়েছে। মুনশীজী খৃস্টধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় ইসলামকে বরণ করে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়েছেন। 'তিনি ১৩২৫ সালে উদ্যোগী হয়ে নিজ গ্রাম গাঁড়াডোব-মেহেরপুর অঞ্চলে প্রথম গো-কোরবানী করান। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বাধা এসেছিল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম হয়েছিল। তবু তিনি নিরস্ত হননি। এ তথ্য মেলে 'মুনশী সেখ জমিরুদ্দীন' জীবনী গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৪৩)। গ্রন্থের এই স্থানেই আছে—

'এই ঘটনা সম্পর্কে মেহেরপুরের হাজী দীল মোহাম্মদ ওরফে দীলু ডাক্তার (১৮৯০-১৯৮৩) যে ছড়া বেঁধেছিলেন তা আজও গ্রামাঞ্চলে শোনা যায় :—

ছি ছি জ্বলে মোলাম প্রাণে তো আর সয়না
মুনশীজীর এমন ঠেলা গোঁসাইরা আর গাঁড়াডোবে রয়না।
মেহেরপুরের মাড়োয়াবাদী তারা সব না হয় রাজি
জালিরাম এসে ধসে মুনশীজীর পা চেপে
এক লক্ষ টাকা দেবে তোমায় শ্বেতপাথরে মসজিদ করেন
আর ছাগল কিনে কোরবানী দেন।...[১০৬]

গাঁড়াডোব গ্রামে হিন্দু মুসলমানের বাস ছিল। গোঁসাইরা ছিলেন গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। এতকাল তাঁরা সদ্ভাবের সঙ্গে বাস করেছেন। এখন নিরুপায় সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে উঠে যেতে উদ্যোগী। জালিরাম আগরওয়ালা ছিলেন মেহেরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিনি মুনশীজীর পা চেপে ধরে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায় তখন দেশের সামাজিক পরিস্থিতি কোন দিকে চলছিল। এই মুনশীজী ও তাঁর অনুগামীরা খৃস্টান মিশনারিদের বিরুদ্ধেও অভিযান চালাচ্ছিলেন সমানভাবে। এভাবেই সেদিন নদীয়া জেলায় মুসলমান মৌলবাদী শক্তির উত্থান ও প্রসার ঘটছিল। নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস যেন তারই বিরুদ্ধে উদার মানবিকতার স্পষ্ট প্রতিবাদ। আগে যেমন লিখেছেন, 'হিন্দু না

ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোনজন ?' উপন্যাসে যেন তারই সূত্র ধরে বলতে চেয়েছেন—'মুসলিম না ওরা ক্রীশ্চান ওই জিজ্ঞাসে কোন জন ?' সমগ্র উপন্যাস জুড়ে যেন বলতে চেয়েছেন—'অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ।' আর বলতে চেয়েছেন—ধর্মান্ধতা, ধর্মসংঘাত অসার। দারিদ্র্যই আমাদের পরম শত্রু। কাহিনীর পরতে পরতে দারিদ্র্যের ভয়াল মূর্তি গ্রাস করছে জনজীবনকে। তাই কাম্য হচ্ছে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে মুক্তি। উপন্যাসে তাই মৌলবী মোড়লদের গৌরব কথা নেই। দেখানো হয়েছে মেজ বউ-এর পরিণতি —সকল সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠে সে তার পল্লীর উন্নতি কামনা করছে, দীন দরিদ্র অসহায় পল্লীবাসীর সন্তানদের লেখাপড়া শেখাবার মানসে সে তার বাড়ির উঠোনে পাঠশালা খুলে নিজে শিক্ষা দেবে। খৃস্টান মিশনারীদের সান্নিধ্যে এসে, তাঁদের সাহায্য সহযোগিতায় সে যেটুকু শিক্ষার আলো পেয়েছে—সেই আলোটুকু ছড়িয়ে দেবে পাড়ায় —অবহেলিত শিশুদের চোখে, মনে। নজরুল যেন বলতে চেয়েছেন, এটাই মানুষের ধর্ম—মুক্তি বা উত্তরণের সোপান।

চাঁদ সড়কে নজরুল ইসলামের নিকট প্রতিবেশী এস. এম. আকবরউদ্দীন তাঁর 'চাঁদ সড়কে নজরুল' নিবন্ধে জানিয়েছেন যে, কোন এক গ্রাম্য মৌলবীর আক্রমণাত্মক চিঠিই নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার উৎস।

এস. এম. আকবরউদ্দীনের জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, ১৯২৭ সালে তিনি আনজুমানে ইসলামিয়ার কৃষ্ণনগর শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। এই পদে তিনি ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই সংস্থার সঙ্গে মুনশী সেখ জমিরুদ্দীনও যুক্ত ছিলেন। এই সংস্থার একটি প্রতিবেদনে খৃস্টান পাদরী কর্তৃক নদীয়া জেলার বহু মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে। সে বিবরণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এস. এম. আকবরউদ্দীন কবির সঙ্গে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস রচনার প্রাক্কালে পল্লীর সমস্যা নিয়ে অনেক কিছু আলোচনা করেছিলেন বলে তাঁর নিবন্ধে ইঙ্গিত এবং কিছু বিবরণ মেলে। এখন অনুমিত হয় যে,

তিনি এই সময় পাদরী কর্তৃক মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার সমস্যাটিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে কবিকে শুনিয়েছিলেন। আর কবি সেই কারণেই ধর্মান্তরকরণকেই কাহিনীতে বিশেষভাবে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের ভাবনা মতো, সে ভাবনা মৌলবাদী চিন্তার পরিপন্থী। এমন অনুমানের কারণ এই যে 'মৃতুক্ষুধা' উপন্যাসও লেখা শুরু হয়েছে ১৯২৭ সালেই।

সেদিন মুসলিম মৌলবাদী গোষ্ঠির রাজনীতি ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল ইংরাজ শাসকের পক্ষাবলম্বন করা। অর্থাৎ যাবতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করা সক্রিয়ভাবে। নজরুল ইসলাম ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী। সক্রিয় ভাবেই। তিনি মনে করতেন বাংলার মুসলমান যুবকদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত, কেননা দেশটা তাদেরও। ইংরাজের শাসন ও শোষণের কুফল তাদেরও ভোগ করতে হচ্ছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে তিনি এ প্রসঙ্গে অনেক আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি মুসলমান যুবককে বিপ্লবের পথে এনে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠিয়েছেন। 'মৃত্যুক্ষুধা'য় তেমনি নায়ক হিসাবে এসেছে মুসলমান বিপ্লবী যুবক আনসার। তার টুপিতে তরবারি ও ত্রিশূল চিহ্ন অঙ্কিত। অর্থাৎ হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারী বল সন্তান মোর মার। তাই 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' ও 'মৃত্যুক্ষুধা' নজরুল-মানস বিচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রচনা।

মনে প্রশ্ন জাগে—সেদিন কাজী নজরুল ইসলাম যদি কৃষ্ণনগরে না আসতেন তাহলে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় সম্মেলনের জন্য উদ্বোধন সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব কি তাঁর ওপর অর্পিত হতো? তা না হলে কি কাণ্ডারী হুঁশিয়ারের মতো অবিস্মরণীয় সঙ্গীতটি রচিত হতো? তিনি যদি কৃষ্ণনগরে না আসতেন এবং চাঁদ সড়ক পল্লীতে বাস না করতেন তাহলে কি 'মৃত্যুক্ষুধা'র মতো সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসটি রচিত হতো? যদি গ্রেস কটেজ বাড়ির পরিবেশ না পেতেন তাহলে কে জানে—তাঁর গজল গান রচনার অবকাশ ও প্রেরণা মিলত কিনা। অর্থাৎ এই গুরুত্বপূর্ণ রচনাগুলি এবং তাঁর মানস বিবর্তনের সঙ্গে তাঁর

কৃষ্ণনগরে আগমন ও অবস্থানের সম্পর্ক নিবিড়, অচ্ছেদ্য। তাই কৃষ্ণনগর বাস তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের একাধিক প্রথিতযশা কবির স্মৃতি বিজড়িত স্থান। এঁদের ভিতর দুজন কবি কৃষ্ণনগর তথা নদীয়ার পটভূমিতে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে। একজন, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, অন্যজন কাজী নজরুল ইসলাম। ভারতচন্দ্র ছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। রাজ নির্দেশেই তিনি রচনা করেছিলেন 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য। তাই সেখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর বংশ কথাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং তাঁদেরই সাহায্য কীর্তিত হয়েছে। সেখানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে—যা তৎকালীন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট সভ্য সমাজের উজ্জ্বল বিবরণ। এক্ষেত্রে রাজাকে তুষ্ট করাই ছিল কবির প্রধান লক্ষ্য। তবু জনসাধারণের কথা বলার সুযোগ পাওয়া মাত্রই কবি সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্র এবং ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে তার প্রার্থনাবাণী শুনিয়েছেন—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' অর্থাৎ সাধারণ মানুষ দুঃস্থ, অসহায় দুঃখী। দু'বেলা দু'মুঠো ক্ষুধার অন্নসংগ্রহই তার পক্ষে কঠিন কাজ। সেটাই তাদের দিন রাত্রির ভাবনা। যাকে বলা হয়, 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' অন্নদামঙ্গল কাব্যে কবির এটাই স্বাধীন নিজস্ব বক্তব্য। এটা তাঁর নিজেরও জীবনকথা।

কাজী নজরুল ইসলাম কোন রাজসভার কবি ছিলেন না। তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের আমন্ত্রিত সম্মানীয় অতিথি। তিনি প্রথমে রচনা করেছেন 'দারিদ্র্য' কবিতা। তারপর লিখেছেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। কৃষ্ণনগরের একটি পল্লীর জনজীবনকেন্দ্রিক কাহিনী। সে কাহিনী রচনায় লেখকের কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। কারও নির্দেশেও লিখিত হয়নি। কবি তাঁর আন্তর তাগিদে এ কাহিনী রচনা করেছেন। সে কাহিনীতে ঘটেছে জনজীবনের দারিদ্র্য আর অসহায়তার উলঙ্গ প্রকাশ। ঈশ্বরী পাটনীরা এখানে ছন্নছাড়া, ক্ষুধার তাড়নায়, দারিদ্র্যের পীড়নে হাহাকাররত। কবির নিজের জীবনও দারিদ্র্যপীড়িত।

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন এক যুগ সন্ধিক্ষণে—পলাশীর যুদ্ধের বছর দুই আগে। কিন্তু তখনো তিনি রাজার সভাকবি, তখনো সামন্ততান্ত্রিক যুগ, তাই ঈশ্বরী পাটনীর পক্ষে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে নিজের অভাবের কথা জানানো ছাড়া আর গতি ছিল না। দেবীও যা সামন্ত রাজাও তাই। সেখানে আবেদন নিবেদন ছাড়া আর কি-ই-বা করা যায়?

নজরুলের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসও রচিত হয়েছে আরেক যুগ-সন্ধিক্ষণে। ইংরাজ শাসনের অবসানকালের বিশ বছর আগে। এই দশ বছর ইংরাজ শাসনকালে ঈশ্বরী পাটনীদের প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া দূরে থাক, তাদের দশা বেহাল হয়েছে দিনের পর দিন। কোথায় দেবী অন্নপূর্ণা? মঙ্গলকাব্যের যুগ তো ভারতচন্দ্রে বা অন্নদামঙ্গলেই শেষ হয়েছে—পাঠান মোগল নবাব যুগ-এর অবসানের সঙ্গেই। মধ্যযুগ সমাপ্ত। তার বিশ্বাসে, আচরণ এক কথায় তার ভূমিকাই সমাপ্ত। ইংরাজ যুগ—যুক্তি-তর্ক-বিচারের যুগ। ক্রমে রাজনৈতিক তৎপরতার যুগ। তাই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে আছে ঈশ্বরী পাটনীদের কাতর ধ্বনি—হাহাকার, কিন্তু দেবী অন্নপূর্ণার উপস্থিতি নেই। সেখানে আবির্ভূত বিপ্লবী যুবক আনসার। সে বলশেভিক ভাবনায় ভাবিত। কোন দেবতার কাছে নিষ্ফল প্রার্থনা নয় আর। দৈবের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। সমাজের দুর্বল শ্রেণীকে সংগঠিত করতে চায় সে, নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিতে। আত্মনির্ভর হবার ডাক—আনসারের।

ভাবতে গেলে মনে হয়, ভারতচন্দ্রের কাল থেকে নজরুল ইসলামের কাল পর্যন্ত বঙ্গদেশের যে ইতিহাস—তাকেই অবলম্বন করে অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র যে কাহিনী শুরু করেছিলেন, নজরুল ইসলাম যেন সেই কাহিনীরই আরেক অধ্যায় রচনা করেছেন 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে।

আরও কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় দুই কবির মধ্যে কৃষ্ণনগরে আগমন বিষয়ে। ভারতচন্দ্র বেকার দশায় জীবন কাটাচ্ছিলেন চন্দন-নগরে। তাঁর বয়স তখন চল্লিশ। বিবাহিত। কিন্তু আর্থিক কারণে স্ত্রীকে নিয়ে সংসার পাতা সম্ভব হয়নি। স্ত্রী তাঁর পিতৃগৃহেই

পড়েছিলেন। কবি একাকী অন্যের অনুগ্রহভাজন হয়ে কোনমতে দিন-যাপন করছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে আমন্ত্রণ জানান কৃষ্ণনগরে আসার জন্য। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগরে এলে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে সভাকবি পদে বরণ করেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর এসেছিলেন হুগলী জেলার চন্দননগর থেকে।

কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন হুগলীতে। সেখানে তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন। সেই সঙ্গে আর্থিক অভাব অনটনের ফলে সংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তখন কৃষ্ণনগরের হেমন্তকুমার সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে এসে বসবাস করার জন্য। হেমন্তকুমার সরকার রাজা ছিলেন না। কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে উদ্বোধন সঙ্গীত রচনার দায়িত্ব দিয়ে বস্তুত কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন সভাকবির পদেই বরণ করা হয়েছিল।

এই সব দিক বিচার বিবেচনা করলে মনে হয়, কাজী নজরুল ইসলামের কৃষ্ণনগরে আগমন ও অবস্থান ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতো কোন আকস্মিক ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। এই আগমন যেন পূর্ব নির্ধারিত বা প্রত্যাশিতই ছিল।